ব্যাখ্যা :—ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ব্যতীত অন্যান্য অনেকেই ইমাম মোক্তাদী উভয়কেই এই হাদীছের আওতাভুক্ত করিয়া বলেন যে, ইমাম এবং ইমামের পেছনে প্রত্যেক মোক্তাদিকেই আলহামদু ছুরা পড়িতে হইবে; ইমাম বোখারী (রঃ)ও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু অন্য বড় বড় মোহাদ্দেছগণ বলিয়াছেন, এই হাদীছের মূল উদ্দেশ্য ঐ নামাযী ব্যক্তি যে কোন ইমামের সঙ্গে মোক্তাদি না হয়। কারণ, মোক্তাদীদের জন্য ভিন্ন দুইটি বিশেষ হাদীছ বর্ণিত আছে। প্রথম হাদীছটির মর্ম এই যে রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, ইমামের সঙ্গে একতেদা করিলে কতকগুলি নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়, যেমন—ইমাম "ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহু" বলিলে মোক্তাদি উহা না বলিয়া তৎপরিবর্তে "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলিবে। তেমনিভাবে وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ইমাম যখন পড়িবে তখন মোক্তাদিগণ (পড়ায় লিপ্ত না হইয়া) চুপ থাকিবে (মোসলেম শরীফ)। দ্বিতীয় হাদীছটি—রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ইমামের একতেদা করিবে, ইমামের কেরাতই তাহার পক্ষে কেরাত বলিয়া গণ্য হইবে (সে নিজে কেরাত পড়িবে না)। [ইবনে মাজাহ্ শরীফ]

এই বক্তব্য অনুসারে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, মোক্তাদি ইমামের সাথে যেরূপ অন্য ছুরা পড়ে না তদ্রূপ আলহামদু ছুরাও পড়িবে না।

পাঠকবৃন্দ! এখানেও ইমামগণের মতভেদ অতি সামান্য বিষয়ে। ইহা শুধু নিয়ম ও পদ্ধতির বিভিন্নতা* উভয় নিয়মেই মূল নামায শুদ্ধ হইবে, ইহাতে দ্বিমত নাই।

---

* অন্যান্য ইমামগণ যে নিয়ম প্রবর্তন করিতে চাহেন উহা সুফলপ্রসূই বটে, কারণ মোক্তাদীগণ চুপ করিয়া দাড়াইয়া থাকিলে তাহাদের মন নানা চিন্তা ও খেয়ালে মত্ত হইবে, তাহাদের অন্তরে নানা অছওয়াছা উদয় হওয়ার সুযোগ পাইবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফার বর্ণিত নিয়মের তাৎপর্য অতি গভীর যে—আলহামদু ছুরাটি হইল আল্লার দরবারে আরজী ও দরখাস্ত পেশ করা। আলহামদু ছুরার অর্থ ইহাই প্রমাণ করে, তা ছাড়া ইহার দ্বিতীয় নাম হইল "তা'লিমুল-মছআলাহ" অর্থাৎ দরখাস্তের মুসাবিদা। বাদশার দরবারে যখন একদল লোক কোন দরখাস্ত পেশ করিতে উপস্থিত হয় তখন অবশ্য দরবারের আদব-কায়দা সকলেরই আদায় করিতে হয়, কিন্তু আরজী ও দরখাস্ত পেশ করা বা যাহা কিছু বলার দরকার হয় তাহা একমাত্র তাহাদের নেতাই বলিয়া থাকেন। সকলে এক সঙ্গে বলা আরম্ভ করে না, বরং তাহারা চুপ করিয়া বাদশার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাহার দরবারের মাহাত্ম্য ও প্রভাবের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকে এবং আরজ সমাপ্তে সমর্থনসূচক কোন একটি শব্দ বলিয়া দেয় মাত্র। এখানেও তদ্রূপ—তক্বীর, তছবীহ এবং রুকু-সেজদা ইত্যাদি সম্ভাষণ ও আদব-কায়দা সকলেরই তামীল করিতে হইবে। আলহামদু ছুরার দ্বারা আরজী ও দরখাস্ত শুধু নেতাই (ইমাম) পেশ করিবেন। মোক্তাদিগণ সকলে আল্লার দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রভাবের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকিবে এবং ইমাম কর্তৃক দরখাস্ত পড়ায় শব্দ শুনা গেলে উহার প্রতিটি অক্ষরের প্রতি একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য রাখিবে ও দরখাস্ত সমাপ্তে সম্মতিসূচক শব্দ 'আমীন' বলিবে। "আমীন" অর্থ—আমিও ইহাই চাই বা হে আল্লাহ কবুল করুন।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিভিন্ন নামাযের মধ্যে কেরাতের বিবরণ

৪৪২। **হাদীছ ঃ**—আবু কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামাযের প্রথম দুই রাকাতে আলহামদু ছুরার সঙ্গে অন্য ছুরাও পড়িতেন ; সময়ে কোন আয়াত সশব্দে পড়িতেন (যদ্বারা আমরা উহা উপলব্ধি করিতাম)। শেষের দুই রাকাতে শুধু আলহামদু ছুরা পড়িতেন এবং দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেরাত পড়িতেন। আছরের নামাযেও তদ্রূপই করিতেন। ফজরের নামাযের প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেরাত পড়িতেন।

৪৪৩। **হাদীছ ঃ**—আবু মা'মার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা খাব্বাব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি জোহর ও আছরের নামাযে কিছু পড়িতেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা আপনারা কিরূপে জ্ঞাত হইলেন ? (উক্ত দুই ওয়াক্তের নামাযে উচ্চৈস্বরে কিছু পড়া হয় না।) তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাড়ি মোবারক যে নড়াচড়া করিত তাহা লক্ষ্য করিয়া আমরা উহা উপলব্ধি করিতাম।

৪৪৪। **হাদীছ ঃ**—একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছুরা "ওয়াল-মোরসালাত" তেলাওয়াত করিলেন। তাঁহার মাতা উহা শুনিয়া বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র! তুমি আমাকে একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। এই ছুরাটি শুনিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালের কথা আমার মনে পড়িল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

পাঠকগণ! লক্ষ্য করিবেন ; এখানে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য দুইটি বিষয়ের সমষ্টি। প্রথম—মোক্তাদি চুপ করিয়া থাকিবে ; আলহামদু ছুরা পড়িবে না। দ্বিতীয়—তাহার অন্তর আল্লার ভয়-ভক্তি, সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লার দরবারের মাহাত্ম্য ও প্রভাবে পরিপূর্ণ রাখিবে, অছওয়াছাহ বা অন্য খেয়াল তাহার অন্তরে যেন বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়। সে যেন আল্লার দরবারে হাজির হইয়াছে, সে যেন আল্লাহকে দেখিতেছে ; আল্লাহও তাহাকে দেখিতেছেন ; এই অবস্থা তাহার উপর প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। সে জন্যই হাদীছে বলা হইয়াছে— الصلوة معراج المؤمن "প্রত্যেক মোমেনকে তাহার নামায মে'রাজ (আল্লার দরবারে উপস্থিতি) রূপে পরিগণিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিষয়টি ইমাম আবু হানিফার আসল উদ্দেশ্য। ইহারই প্রতি বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমি ইমামের পেছনে থাকাকালীন আলহামদু ছুরা পড়িব কি ? তিনি বলিলেন—ان لک فی الصلوة لشغلا "তোমার উপর নামাযের মধ্যে একটি অতি বড় বিশাল মগ্নতা ও ধ্যানের চাপ রহিয়াছে, তুমি উহাতেই নিয়োজিত থাক।"

আফছুছ! বর্তমান হানফী মজহাবের নামধারীরা প্রথম বিষয়টির প্রতি খুবই আগ্রহান্বিত ; কারণ উহা সহজ আরামদায়ক। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য আদৌ কোন চেষ্টা করে না, ইহাতে ইমাম আবু হানিফার মজহাবের অনুসরণ হয় না, বরং অবমাননা করা হয়।

অসাল্লামের সঙ্গে আমি যে নামায পড়িয়াছিলাম উহা মগরেবের নামায, সেই নামাযে তিনি এই ছুরাটি পাঠ করিয়াছিলেন।

৪৪৫। হাদীছ ঃ—জোবায়ের ইবনে বোত্‌য়েম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মগরেবের নামায পড়িতেছিলাম, সেই নামাযে তিনি (২৭ পারার) ছুরা "ওয়াত-তুর" পড়িলেন। ঐ ছুরার নিম্নে বর্ণিত আয়াতটির বিষয়বস্তু এইরূপভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল যে, উহা শুনিয়া আমার মনে হইতেছিল, যেন আমার প্রাণ পাখী উড়িয়া চলিয়া যাইবে।

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ - أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

بَلْ لَّا يُوقِنُونَ - أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ -

অর্থ—(আল্লাহ তায়ালা এখানে নাস্তিকতার মতবাদ খণ্ডন পূর্বক তিরস্কার স্বরূপ বলিতেছেন—) জগদ্বাসী কি কোন স্রষ্টা ব্যতিরেকেই সৃষ্টি হইয়াছে? বা তাহারাই কি পরস্পর একে অন্যকে সৃষ্টি করিয়াছে? এই সমস্ত আসমান, জমিনকেও তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে কি? (এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর তাহাদেরও মনে-প্রাণে জাগিয়া উঠে,) কিন্তু তাহারা উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারপর আরও একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করুন যে—যে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ তাহারা ভোগ করিতেছে তাহা কি তাহারা তাহাদের পালনকর্তার ভাণ্ডার হইতে পাইতেছে, না সক্রিয় ভাবে তাহারাই উহার উৎস?

অর্থাৎ যাহারা নাস্তিক—যাহারা আল্লার অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে চায় না তাহাদিগকে তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বলুন। প্রথম প্রশ্ন—তাহারা কি সৃষ্ট না স্রষ্টা? যদি সৃষ্ট হয় তবে নিশ্চয় কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন; কারণ, কর্তা ব্যতিরেকে ক্রিয়া ও কর্ম হইতে পারে না। আর যদি তাহারা নিজেকেই (পরস্পর একে অন্যের) স্রষ্টা বলিয়া ধারণা করে তবে প্রশ্ন করুন যে, এই সপ্ত আকাশ ও বিশাল ভূমণ্ডলের স্রষ্টাও কি তাহারাই। আরও প্রশ্ন করুন, তাহারা জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত সম্পদ উপভোগ করিয়া থাকে; যেমন—অগ্নি, বায়ু, পানি, মাটি, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি। এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সমস্ত দৈহিক ও ইন্দ্রিয়-শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে; যেমন—হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদির শক্তি এবং অর্থ সামর্থ্য। এদদ্ভিন্ন কৃষি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে উন্নতি করার জন্য ভিতরের বা বাহিরের যে সমস্ত শক্তি ও পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে; যেমন—বুদ্ধি-বিবেক, মস্তিষ্ক ও (Raw moterials) উপাদান পদার্থ সমূহ। এসব সম্পদ, শক্তি ও পদার্থ সমূহের উৎস কোথায়? তোমরা কি নিজে নিজেই সক্রিয় ভাবে এ সবের অধিকারী? না তোমাদের কোন পালনকর্তা আছেন যিনি তোমাদিগকে এসব যোগাইতেছেন এবং স্বীয় কৃপাবলে দান করিতেছেন?

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এমন নয় যে, তাহাদের মনে উহা জাগে না। নিশ্চয় এ সবের সঠিক সঠিক উত্তর তাহাদেরও মনে-প্রাণে জাগিয়া উঠে, কিন্তু তাহারা ঐ জাগ্রত ভাবকে অবহেলারূপে অবজ্ঞা করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারাও নির্জনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে এই সকল প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিয়া দেখুন; আপনার মন আপনাকে যেই সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার প্রতি ধাবিত করে তাঁহার কি হক ও স্বত্ব আপনার উপর প্রবর্তিত হইতে পারে, তাহাও চিন্তা করুন। দেখিবেন আপনার হৃদয়-পাখীও যেন উড়িয়া যাইতে চাহিবে। যেমন উক্ত ছাহাবীর অবস্থা হইয়াছিল।

৪৪৬। **হাদীছ:**—ছাহাবী যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) তাঁহাদের দেশের শাসনকর্তা মারওয়ানকে বলিলেন, আপনি মগরেবের নামাযের মধ্যে শুধু ছোট ছোট ছুরাই পড়িয়া থাকেন। অথচ আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মগরেবের নামাযে অতি দীর্ঘ ছুরা (আ'রাফ)ও পড়িতে শুনিয়াছি।

৪৪৭। **হাদীছ:**—ছাহাবী বরা (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ছফরে ছিলেন। আমি তাঁহাকে নামাযের মধ্যে ছুরা "ওয়াত্তীন" পড়িতে শুনিয়াছি। তিনি যেরূপ শুদ্ধ কেরাত ও খোশ-এলহানে পড়িয়াছিলেন, ঐরূপ আর কাহারও মুখে শুনি নাই।

৪৪৮। **হাদীছ:**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নামাযের সব রাকাতেই কোরআনের অংশবিশেষ পড়িতে হয়—যে সব নামাযে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সশব্দে কেরাত পড়িতেন আমরাও সেই নামাযে ঐরূপই পড়িব। যে সব নামাযে তিনি নিঃশব্দে পড়িতেন সেই নামাযে আমরাও ঐরূপই পড়িব। (তিনি আরও বলেন—) তুমি যদি (অন্য ছুরা না জানার দরুন) শুধু আলহামদু ছুরা দ্বারা নামায পড় তবুও তোমার নামায হইয়া যাইবে। কিন্তু (যথা সম্ভব) অন্য ছুরা (শিক্ষা করিয়া উহা) আলহামদুর সহিত মিলাইয়া নামায আদায় করাই তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

৪৪৯। **হাদীছ:**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রত্যেকটি কাজ আল্লার হুকুম অনুসারেই করিতেন—যে স্থানে যাহা পড়িতেন (যেমন নামাযের প্রথম দুই রাকাতে আলহামদু ছুরার সঙ্গে অন্য ছুরাও পড়িতেন) আল্লার আদেশেই তাহা পড়িতেন এবং যে স্থানে যাহা না পড়িতেন (যেমন—ফরজ নামাযে শেষ দুই বা এক রাকাতে শুধু আলহামদু পড়িতেন, অন্য ছুরা পড়িতেন না) তাহাও আল্লার আদেশেই করিতেন। (ইহা সর্বজন বিদিত সত্য যে,) আল্লার কোন কার্য্যেই ভুল-ভ্রান্তির বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তাই জগদ্বাসীর জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শের ন্যায় (ত্রুটিহীন) উত্তম আদর্শ আর হইতে পারে না।

ছুরার অংশবিশেষ বা এক রাকাতে দুই ছুরা পড়া

● একদা নবী (দঃ) ফজরের নামাযের ছুরা "মুমেনুন" পড়া আরম্ভ করিলেন। উক্ত ছুরায় হযরত মুছা ও হারুনের কিম্বা হযরত ঈসার আলোচনার আয়াতে পৌঁছিলে হযরতের হাঁচি আসিল। হযরত (দঃ) ওখানেই কেরাত ক্ষান্ত করিয়া রুকুতে চলিয়া গেলেন।

● একদা ওমর (রাঃ) ফজরের প্রথম রাকাতে ছুরা বাকারা হইতে একশত বিশ আয়াত পড়িলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে একশত আয়াত হইতে কম পরিমাণের অন্য একটি ছুরা পড়িলেন।

● একদা ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথম রাকাতে ছুরা আনফালের চল্লিশ আয়াত পড়িলেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে শেষ ৪।৫ পারার মধ্য হইতে একটি ছুরা পড়িলেন।

● একটি ছুরা ভাল করিয়া উভয় রাকাতে পড়া বা প্রথম রাকাতে যেই ছুরা পড়িয়াছে দ্বিতীয় রাকাতে পুনরায় ঐ ছুরাই পড়া সম্পর্কে তাবেয়ী কাতাদাহ (রঃ) বলিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই; সবই আল্লাহ তায়ালার কেতাবের অংশ।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী আহনাফ ইবনে কায়স (রঃ) প্রথম রাকাতে ছুরা কাহাফ, দ্বিতীয় রাকাতে ছুরা ইউসুফ বা ছুরা ইউনুস পড়িয়াছেন ও বলিয়াছেন, তিনি খলীফা ওমরের পেছনে এইভাবে ফজরের নামায পড়িয়াছেন।

● কেরাত লম্বা করার জন্য এক রাকাতে একাধিক সুরা পড়া জায়েয আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কোন ছুরার অংশ বিশেষ পড়ায় দোষ নাই বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন আছে। কারণ এরূপ আয়াত হইতে আরম্ভ করা যাহার বিষয়বস্তুর জরুরী অংশ পূর্বের আয়াতে থাকিয়া গিয়াছে বা এরূপ আয়াতের উপর ক্ষান্ত করা যাহার বিষয়বস্তু নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—ইহা মকরূহ এবং স্থান বিশেষে ত এইরূপ অসম্পূর্ণতা অত্যন্ত তিক্ত ও অপ্রিয় হয়; এরূপ ক্ষেত্রে কঠিন মকরূহ সাব্যস্ত হইবে (ফতহুল বারী, ২-২০০)। সুতরাং অর্থ বুঝা ব্যতিরেকে যথেচ্ছাভাবে ছুরার অংশ কাটিয়া পড়া সমীচীন নহে।

প্রথম রাকাতে পরের ছুরা এবং দ্বিতীয় রাকাতে আগের ছুরা পড়া জায়েয আছে, কিন্তু মকরূহ। অবশ্য ছুরা সমূহের বিন্যাসে ছাহাবীগণের মতভেদ ছিল। পরবর্তী যুগে খলীফা ওসমানের বিন্যাসই প্রচলিত রহিয়াছে, তাই উহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

৪৫০। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন আনছারী ছাহাবী কোবা নগরীর মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি যে কোন রাকাতে আলহামদুর ছুরার পর অন্য ছুরা পড়িতেন সেই অন্য ছুরার পূর্বে ছুরা ইখলাছ অবশ্যই পড়িয়া লইতেন, তারপর ঐ অন্য ছুরা পড়িতেন। প্রতি রাকাতেই তিনি এরূপ করিতেন। মোক্তাদীগণ তাঁহার এই অভ্যাসের সমালোচনা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—আপনি ছুরা এখলাছ পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছুরাও পড়েন কেন? হয় শুধু ছুরা এখলাছ পড়ুন, নতুবা শুধু অন্য ছুরাটিই পড়ুন। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আমি আমার এই নিয়ম ত্যাগ করিব না। তোমরা যদি ইহা

ভালবাস তবে আমি তোমাদের ইমামতী করিব, নচেৎ ইমামতী করিব না। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সর্বোত্তম—ইমামতীর উপযুক্ত, তাই তাঁহারা অন্য কাহাকেও ইমাম বানাইতে রাজী ছিলেন না। অতঃপর সকলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করতঃ অভিযোগ পেশ করিলেন। নবী (দঃ) ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি তোমার সাথীদের পরামর্শ গ্রহণ কর না কেন? তুমি ছুরা এখলাছকে এরূপ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছ কেন? তিনি আরজ করিলেন, আমি এই ছুরাটিকে আমার প্রাণ দিয়া ভালবাসি। (কারণ, এই ছুরাটি আমার মা'বুদের ছানা-ছিফৎ ও গুণগানে পরিপূর্ণ।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই ছুরার প্রতি গভীর ভালবাসা তোমাকে বেহেশতের অধিকারী বানাইয়া দিয়াছে।

৪৫১। **হাদীছ ঃ**—এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আসিয়া বলিল, আমি গত রাত্রে তাহাজ্জুদ-নামাযের মধ্যে এক রাকাতেই "ছুরা কাফ" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছুরাগুলি পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, কবিতার ন্যায় ফর ফর করিয়া পড়িয়া শেষ করিয়া থাকিবে। (মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই শুধু পড়িয়া গিয়াছ, কিন্তু এরূপ না করিয়া প্রতিটি বাক্যের মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অল্প পড়াও ভাল।) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই যেই ছুরাগুলি একত্রে এক রাকাতে পড়িতেন আমি সেই ছুরাগুলি জানি। তিনি একত্রে (অর্থের দিক দিয়া) সমতুল্য দুইটি ছুরা পড়িতেন। (বেশী পড়িতেন না, কারণ তিনি মানে-মতলবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পড়িতেন।)

মছআলাহ ঃ—জোহর, আছর ও এশার শেষ রাকাতদ্বয়ে এবং মগরেবের তৃতীয় রাকাতে শুধু আলহামদু ছুরা পড়িবে; উহার সঙ্গে আর কোন ছুরা বা আয়াত পড়িবে না। সুতরাং প্রথম রাকাতদ্বয় অপেক্ষাকৃত লম্বা হইবে। ফজরেও প্রথম রাকাত অধিক লম্বা করিবে।

মছআলাহ ঃ— জোহর ও আছরে সম্পূর্ণ কেরাতই নিঃশব্দে পড়িবে। (১০১ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—ইমাম যদি নিঃশব্দের নামাযে (স্বেচ্ছায় কোন উদ্দেশ্য বশতঃ ছোট) এক আয়াত পরিমাণ সশব্দে পড়ে তবে তাহাতে দোষ নাই; (উহাতে সেজদা-ছুহু দিতে হইবে না (১০৭ পৃঃ ৪৬১ হাঃ)। কিন্তু যদি বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ নিঃশব্দের স্থানে সশব্দে কিম্বা সশব্দের স্থানে নিঃশব্দে পড়ে; ইচ্ছাকৃত কিম্বা ভুলে তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সেজদা-ছুহু দিতে হইবে। আর যদি উক্ত পরিমাণ হইতে কম ঐরূপ করে ভুলবশতঃ অথবা কোন বিধেয় উদ্দেশ্য ছাড়া ইচ্ছাকৃত তবে সেজদা-ছুহু দেওয়া ওয়াজেব নহে, কিন্তু উত্তম। (শামী, ১—৬৯৫)

"আমীন" বলার ফজিলত ও নিয়ম

৪৫২। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ইমাম আলহামদু ছুরা শেষ করিয়া আমীন বলিবে, তুমিও

তখন আমীন বলিও। (ঐ সময়) ফেরেশতাগণও আমীন বলিয়া থাকেন। যাহাদের আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সঙ্গে সঙ্গে হইবে তাহাদের পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। নবী (দঃ) আমীন বলিতেন।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) ইমাম ও মোক্তাদী উভয়ের জন্য "আমীন" সশব্দে পড়ার কথা বলিয়াছেন, (অর্থাৎ জেহ্‌রী নামাযে) এবং ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ দিয়াছেন।

"আমীন" জেহ্‌রী নামাযে সশব্দে বলায় কোন ইমামের মজহাবেই নামায দূষিত হয় না এবং গোনাহ হয় না। অবশ্য ইমাম আবু হানীফার মজহাবে "আমীন" নিঃশব্দে বলাই সুন্নত তরীকা এবং অন্যান্য ইমামের মজহাবে সশব্দে বলা সুন্নত তরীকা। উভয় নিয়ম সম্পর্কেই হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই সকলেই উভয় নিয়মকে জায়েয বলিয়াছেন।

ছাহাবী আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কার্য্য দ্বারা ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ইমামের সহিত শরীক হইতে যদি কারণ বশতঃ বিলম্ব হইয়া পড়ে তবে যথাসাধ্য ইমামের আমীন বলার পূর্বে (তথা আলহামদ ছুরা সম্পূর্ণ করার পূর্বে, যেহেতু উহা সম্পূর্ণ করিয়াই ইমাম আমীন বলিবেন) ইমামের সহিত শরীক হইতে তৎপর হইবে। কারণ তাহা হইলে ইমামের সহিত আমীন বলার সুযোগ পাইবে যাহার অনেক ফজিলত।

কাতারে শামিল না হইয়া নিয়্যত বাঁধা

৪৫৩। **হাদীছ ঃ**—আবু বকরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি মসজিদে পৌঁছিলেন—যখন নবী (দঃ) রুকুতে ছিলেন। (তিনি ভাবিলেন—ইমামের রুকু শেষ হইবার পূর্বে শরীক হইতে না পারিলে এক রাকাত নামায ছুটিয়া যাইবে এবং পূর্ণ জমাতের সওয়াব পাওয়া যাইবে না,) তাই তিনি তাড়াহুড়ার মধ্যে কাতারে শামিল না হইয়াই নামাযের নিয়্যত করিয়া ফেলিলেন। নামাযান্তে হযরতের নিকট ঘটনা বলা হইলে হযরত (দঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন—আল্লাহ তায়ালা তোমার (অধিক সওয়াব আহরণের চেষ্টা ও) আকাঙ্খাকে বর্দ্ধিত করুন। অতঃপর বলিলেন—কাতারে শামিল না হইয়া নিয়্যত বাঁধিয়াছ—এরূপ কখনও করিও না।

নামাযে প্রত্যেক উঠা-বসায় তকবীর বলিবে

৪৫৪। **হাদীছ ঃ**—মোতাররেফ ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি এবং ছাহাবী এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বছরা শহরে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পেছনে নামায পড়িলাম। তিনি প্রত্যেক সেজদায় যাইতে এবং দুই রাকাতের পর বসা হইতে উঠিতে তকবীর বলিলেন। নামাযান্তে ছাহাবী এমরান (রাঃ) আমার হাত ধরিয়া (আলী (রাঃ)কে লক্ষ্য করতঃ) বলিলেন, তিনি আমাকে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের রূপ স্মরণ করাইয়া দিলেন। হযরত (দঃ) নামাযের প্রতিটি উঠা-বসায় তকবীর বলিতেন।

৪৫৫। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর শাগের্দ একরেমা (রঃ) বলেন—আমি মক্কা শরীফে এক বৃদ্ধের পিছনে জমাতে নামায পড়িলাম। তিনি (চার রাকাত নামাযে) বাইশটি তকবীর বলিলেন। নামাযান্তে আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, এই বৃদ্ধ জ্ঞানশূন্য বলিয়া মনে হয়। (কারণ এতগুলি তকবীর বলার দরকার দেখা যায় না—রুকু হইতে উঠিয়া সেজদায় যাইতে এবং প্রথম সেজদা হইতে উঠিয়া দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে তকবীর না বলিলেও চলে।) ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুই চুপিয়া হইতে উঠিয়া যা; এই বৃদ্ধ যাহা করিয়াছেন তাহাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুন্নত। (ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) ছিলেন, একরেমা (রঃ) তাঁহাকে চিনিতেন না। সেই কালে উমাইয়া বংশের আমীর-ওমরারা ইমামতি করিতে তকবীরের সংখ্যা কম করার প্রথা প্রচলিত করিয়াছিল।)

৪৫৬। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন তকবীর বলিতেন। যখন রুকুতে যাইতেন তখন তকবীর বলিতেন এবং রুকু হইতে উঠিতে "ছামিয়াল্লাহু লেমান হামিদাহ" বলিতেন এবং সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া "রাব্বানা ওয়া লাকালহামদ" বলিতেন। তারপর প্রথম সেজদায় যাইতে এবং সেজদা হইতে উঠিতে, তারপর দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে এবং সেজদা হইতে উঠিতে তকবীর বলিতেন। নামাযের শেষ পর্য্যন্ত এরূপ করিতেন এবং দুই রাকাতের পর বসা হইতে উঠিবার সময় তকবীর বলিতেন।

রুকু অবস্থায় হাঁটুর উপর হাতদ্বয়ের ভর করিবে

৪৫৭। **হাদীছ ঃ**—মোছায়া'ব ইবনে সায়া'দ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতার পার্শ্বে নামায পড়িতেছিলাম। আমি রুকু অবস্থায় আমার দুই হাত জোড় করিয়া হাঁটুদ্বয়ের মধ্যস্থলে লটকাইয়া রাখিলাম। নামাযান্তে পিতা আমাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার প্রথমে এরূপ নিয়মই ছিল, কিন্তু (ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক) এই নিয়ম পরিবর্তন করিয়া দুই হাত হাঁটুর উপর রাখিতে আদেশ করা হইয়াছে

রুকু ও সেজদা ভালরূপে না করার পরিণতি

রুকু ভালরূপে করার অর্থ এই যে—এরূপ শান্তভাবে রুকু করিবে যেন কোমর, পিঠ মাথা সমান বরাবর হয়, এই অবস্থায় অন্ততঃ তিনবার "সোব্হানা রাব্বিয়াল আজীম" বলিয়া পূর্ণ সোজা হইয়া দাঁড়াইলে যেন প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে যাইয়া পৌঁছে।

সেজদা ভালরূপে করার অর্থও তদ্রূপই যে, নিয়ম অনুযায়ী সেজদায় যাইয়া নাক ও কপাল মাটিতে লাগাইয়া রাখা অবস্থায় অন্ততঃ তিনবার "সোব্হানা রাব্বিয়াল-আলা" বলিয়া সোজা হইয়া বসিবে, তারপর পুনরায় সেজদায় যাইবে।

৪৫৮। হাদীছ :—ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে ভালরূপে রুকু-সেজদা করিতেছে না। তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার নামায ঠিক হয় নাই। আরও বলিলেন, তুমি যদি এই অভ্যাসের উপরই থাক তবে আল্লাহ কর্তৃক রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রদত্ত আদর্শ হইতে বিচ্যুত অবস্থায় তোমার জীবন অতিবাহিত হইবে।

রুকু ও সেজদাতে কত সময় অবস্থান করিবে?

৪৫৯। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রুকু, সেজদা ও দুই সেজদার মধ্যে এবং রুকু হইতে দাঁড়াইয়া—এই কয়টি অবস্থায় প্রায় সমপরিমাণ সময় ব্যয় করিতেন।

ভালরূপে রুকু ও সেজদা না করিয়া নামায পড়িলে ঐ নামায পুনরায় পড়িতে হইবে

৪৬০। হাদীছ :— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী (দঃ) মসজিদের এক কিনারায় বসিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া নামায আরম্ভ করিল। (নবী (দঃ) তাহার নামাযের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন।) সে নামাযের রুকু ও সেজদা ভালরূপে ধীরে ধীরে আদায় করিতেছিল না।) লোকটি (এইরূপে) নামায শেষ করিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিল এবং তাঁহাকে সালাম করিল। নবী (দঃ) তাহার সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন—তোমার নামায হয় নাই, তুমি পুনরায় নামায পড়িয়া আস। সে দ্বিতীয়বার নামায পড়িল (কিন্তু ঐ প্রথমবারের মতই পড়িল) এবং হযরতের নিকট আসিয়া সালাম করিল। এবারও তিনি ছালামের উত্তর দিয়া বলিলেন—তোমার নামায হয় নাই, তুমি পুনরায় নামায পড়িয়া আস। সে এইবারও ঐরূপ নামায পড়িল। হযরত নবী (দঃ) তাহাকে ঐরূপই বলিলেন। তিনবার এরূপ করার পর লোকটি আরজ করিল, হুজুর! যে আল্লাহ আপনাকে সত্য ধর্মের বাহকরূপে রসুল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, সেই আল্লার শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, আমি ইহার চেয়ে উত্তমরূপে নামায পড়িতে জানি না। আপনি আমাকে নামায পড়া শিখাইয়া দিন। অতঃপর নবী (দঃ) তাহাকে নামায শিক্ষা দিতে লাগিলেন—তিনি বলিলেন, নামাযের পূর্বে উত্তমরূপে অজু করিবে, তারপর কেবলাদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে, তারপর "আল্লাহু আকবার" বলিবে।* অতঃপর কোরআনের যাহা কিছু ছুরা পড়া তোমার পক্ষে

---

* "আল্লাহু আকবার" এর তাৎপর্য্য এই যে—এক আল্লাহই বড়, আর কেহই বড় নাই। আমি সেই আল্লারই দাসানুদাস। এই বিষয়টি মনে মনে চিন্তা করত: মুখে প্রকাশ করিবে এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠাইয়া ঐ আল্লার মাহাত্ম্য ও নিজের দাসত্বের স্বীকারোক্তিকে প্রমাণ করিবে এবং উহাকেই বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে উভয় হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এবং "ছানা" পড়িয়া আল্লার প্রশংসা করিবে। তারপর "আউজু" পড়িয়া আল্লার আশ্রয় গ্রহণ করত: "বিছমিল্লাহ" পড়িয়া "আলহামদু" ছুরা পড়িবে।

সহজ ও সম্ভব হয় তাহা পড়িবে। তারপর আল্লাহু-আকবার বলিয়া মাথা ঝুকাইবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু করিবে।† তারপর "ছামিয়াল্লাহুলেমান হামিদাহ"⁂ বলিয়া পূর্ণ মাত্রায় সোজা হইয়া দাঁড়াইবে—যেন প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পৌঁছিতে পারে। অতঃপর আল্লাহু-আকবার বলিয়া ধীরস্থিরভাবে উত্তমরূপে সেজদা করিবে।× তারপর মাথা উঠাইয়া স্থিরভাবে বসিবে। পুনরায় ঐরূপে সেজদা করিবে এবং সেজদা হইতে উঠিবে। এইরূপে (ধীরস্থিরভাবে ভক্তি ও মহব্বতের সহিত) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নামায আদায় করিবে।

রুকু ও সেজদার মধ্যে দোয়া করা

৪৬১। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (শেষ বয়সে অনেক সময়) রুকু এবং সেজদার মধ্যে এই দোয়া পড়িতেন—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ -

"হে খোদা—আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই পবিত্রতার গুণগান করিতেছি এবং তোমারই প্রশংসা গাহিতেছি। তুমি আমার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দাও।"

প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া কোরআনের একটি আয়াতের অনুসরণ করিতেন।

ব্যাখ্যাঃ— ছুরা নছরের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের মক্কা বিজয়ের বিরাট সাফল্যের এবং ব্যাপক আকারে ইসলাম বিস্তারের সুসংবাদ প্রদান ও ভবিষ্যদ্বাণী করতঃ রসুলুল্লাহ (দঃ)কে তিনটি বিষয়ের আদেশ দান করেন—

"আপনি স্বীয় পালনকর্তার প্রশংসা করতঃ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার জীবনের শেষ দিকে ঐ সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত দেখিয়া উক্ত আয়াতের আদেশত্রয়ের অনুসরণে ঐ দোয়া করিতেন।

---

† উত্তমরূপে রুকু, সেজদা করার অর্থ ও নিয়ম ৪৫৮ নং হাদীছের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে। রুকু, সেজদায় سبحان ربى العظيم ও سبحان ربى الاعلى পড়া হয়। উহার অর্থ—আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতার স্বীকারোক্তি এবং তাঁহার প্রশংসা করিতেছি।

⁂ ইহার অর্থ—"আল্লার প্রশংসা যে কেহই করুক, আল্লাহ তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া থাকেন"। ইহা বলার পর اللهم ربنا لك الحمد বলিবে। অর্থ—"হে আল্লাহ, হে আমাদের পালনকর্তা; সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই"।

× সেজদা আটটি অঙ্গ দ্বারা করিবে। আটটি অঙ্গ এই—দুই পা, দুই হাঁটু, দুই হাত ও নাক এবং কপাল। এই অঙ্গগুলি জমীনের সহিত স্পর্শিত রাখিবে।

রুকু হইতে উঠাকালে ইমাম কি বলিবে এবং মোক্তাদী কি বলিবে?

৪৬২। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রুকু হইতে উঠিবার সময় "ছামিয়াল্লাহু-লিমান হামিদাহ্" বলিতেন এবং সোজা হইয়া "আল্লাহুম্মা-রাব্বানা-ওয়া-লাকাল-হামদ্" বলিতেন।

৪৬৩। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন ইমাম "ছামিয়াল্লাল্ল-লিমান-হামিদাহ্" বলিবেন তখন তোমরা (মোক্তাদীগণ) "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্" বলিও। কারণ, ঐ সময় ফেরেশতাগণও উহা বলিয়া থাকেন। যাহার ঐ বাক্য ফেরেশতাদের ঐ বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইবে তাহার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

৪৬৪। **হাদীছ ঃ**—রেফাআহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে নামায পড়িতেছিলাম। হযরত যখন ছামিয়াল্লাহু-লিমান হামিদাহ্ বলিয়া রুকু হইতে উঠিলেন, তাঁহার পেছনে একজন মোক্তাদী বলিল—

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.

অর্থাৎ—হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যে, আমাকে তোমার দরবারে হাজির হইবার সুযোগ দান করিয়াছ উহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমার প্রাণে তোমার প্রতি বহু বহু আবেগ আছে যাহা প্রকাশ করিয়া শেষ করার মত নয় এবং আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে খাঁটীভাবে আমি তোমার বহু বহু প্রশংসা করিতেছি; সেই পবিত্র প্রশংসা অফুরন্ত যাহার অন্ত নাই।

নামাযান্তে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, (নামাযের মধ্যে পেছন দিক হইতে কতগুলি শব্দ-উচ্চারণ শ্রুত হইয়াছে; ঐ) শব্দগুলির উচ্চারণকারী কে? ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি ঐ শব্দগুলি বলিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—ঐ শব্দগুলি এত বড় উচ্চ মর্য্যাদাপূর্ণ এবং আল্লার নিকট এত মধুর ও পছন্দনীয় ছিল যে, আমি ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেশতাকে দেখিয়াছি তাঁহারা ছুটাছুটি করিয়া আসিতেছেন যে, কে ঐ শব্দগুলিকে সকলের আগে (আল্লাহ তায়ালার দরবারে পৌঁছাইবার জন্য) লিখিয়া লইতে পারেন।

রুকু হইতে উঠিয়া সোজা ও স্থিরভাবে দাঁড়াইবে উভয় সেজদার মধ্যেও তদ্রূপে বসিবে

৪৬৫। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য সময় সময় নামায পড়িতেন এবং বলিতেন, নবী (দঃ)কে যেইরূপ নামায

পড়িতে দেখিয়াছি, সেইরূপ নামায দেখাইতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন, আনাছ (রাঃ)কে সেইরূপ ক্ষেত্রে এমন একটি কাজ করিতে দেখিয়াছি যাহা তোমাদিগকে করিতে দেখি না। তিনি যখন রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইতেন তখন এরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইতেন যে, আমরা মনে করিতাম যেন তিনি সেজদায় যাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং দুই সেজদার মধ্যেও এরূপ স্থিরভাবে বসিতেন—মনে হইত যেন দ্বিতীয় সেজদায় যাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। (১২০ পৃঃ)

৪৬৬। **হাদীছ ঃ**—বিশিষ্ট তাবেয়ী আবু কেলাবা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী মালেক ইবনে হোয়াইরেছ (রাঃ) আমাদিগকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য ফরজ নামাযের জমাতের সময় ছাড়া অন্য সময় (নফলরূপে) নামায পড়িয়া দেখাইয়াছেন।

একদা তিনি আমাদের মসজিদে আসিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের সম্মুখে নামায পড়িব ; এখন আমার শুধু নামায পড়াই উদ্দেশ্য নহে ; নবী (দঃ)কে কিরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছি তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নামায পড়িব।

আবু কেলাবা (রঃ) সেই নামাযের বর্ণনা দানে বলেন, যখন তিনি দাঁড়াইলেন তখন ধীর-স্থিরতার সহিত সুন্দররূপে দাঁড়াইলেন এবং তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। তারপর রুকু ধীর-স্থিরতার সহিত সুন্দরভাবে করিলেন, রুকু হইতে উঠিয়া কিছু সময় স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন, তারপর সেজদা করিলেন, অতঃপর সেজদা হইতে উঠিয়া কিছু সময় স্থিরভাবে বসিলেন তারপর পুনঃ সেজদা করিলেন। (৯৩, ১১১, ১১৬ পৃঃ)

তকবীর বলার সঙ্গেই রুকু-সেজদার জন্য অবনত হইবে

৪৬৭। **হাদীছ ঃ**—আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) ফরজ এবং অন্য নামায, রমজান শরীফে এবং অন্য সময়ে সব রকম নামাযেই এই নিয়মে তকবীর বলিতেন—প্রথম দাঁড়াইয়া তকবীর বলিতেন, রুকুতে যাওয়াকালে তকবীর বলিতেন, তারপর ছামিয়াল্লাহু লিমান-হামিদাহ্ এবং তৎপর রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্ বলিতেন—সেজদায় যাইবার পূর্বে। অতঃপর সেজদার জন্য নত হইয়া যাইতে আল্লাহু আকবার বলিতেন, তারপর সেজদা হইতে উঠিতে তকবীর বলিতেন, দ্বিতীয় সেজদায় যাইতেও তকবীর বলিতেন এবং উহা হইতে উঠিতেও তকবীর বলিতেন। নামাযের প্রতি রাকাতেই এইরূপ করিতেন এবং দুই রাকাতের বসা হইতে উঠিতেও তকবীর বলিতেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) এইরূপে নামায শেষ করিয়া বলিতেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামাযের সর্বাধিক দৃষ্টান্তে নামায পড়িলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া ত্যাগ করা পর্য্যন্ত এই আকারেই নামায পড়িতেন। (এই হাদীছে বর্ণিত আর একটি বিষয় ৫৪৭ নম্বরে অনুদিত হইবে।)

সেজদার মহত্ত্ব ও ফজিলত

এই পরিচ্ছেদে একটি সুদীর্ঘ হাদীছের উল্লেখ আছে; সেই হাদীছখানার পূর্ণ অনুবাদ সপ্তম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে আসিবে। হাদীছখানার বিষয়-বস্তু হইল হাশর-ময়দান, পুলছেরাৎ, দোযখ ও আখেরাতের নানা অবস্থার বয়ান। উক্ত হাদীছের বয়ানে রহিয়াছে যে, হাশর-ময়দানের হিসাব-নিকাশের পর প্রাথমিক পর্য্যায়ে অনেক মোমেন-মোসলমানও বিভিন্ন গোনাহের পরিণামে দোযখে যাইবে। তারপর শাফায়াত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ঐ সব পাপী মোমেন-মোসলমানদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দয়া হইবে। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দ্বারা ঐ পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিতে থাকিবেন।

দোযখের মধ্যে চিরজাহান্নামী কাফেররা অগণিত সংখ্যায় হইবে। দুনিয়ায় কাফেরের অনুপাতে মোসলমান-সংখ্যা হাজারে একজন মাত্র; এই নগণ্য সংখ্যক মোসলমানও ভাগ হইয়া এক ভাগ বেহেশতে, এক ভাগ দোযখে গিয়াছে। কাফেররা ত সবই দোযখে গিয়াছে। দোযখে এই অসংখ্য কাফেরদের মধ্য হইতে অতি নগণ্য সংখ্যক পাপী মোমেন-মোসলমানকে ফেরেশতাগণ কর্তৃক বাছিয়া বাছিয়া বাহির করার যে ব্যবস্থা হইবে উহার বর্ণনায় উক্ত হাদীছে আছে—

وَيَعْرِفُونَهُمْ بِاٰثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ اٰدَمَ تَاْكُلُهُ النَّارُ اِلَّا اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيٰوةِ

"ফেরেশতাগণ দোযখের মধ্যে ঐ সব পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে তাহাদের চেহারায় সেজদার নিশান বা চিহ্ন দেখিয়া চিনিবেন। আল্লাহ তায়ালা দোযখের আগুনের জন্য অসাধ্য করিয়া দিবেন সেজদার নিশান ভস্ম করা। ঐ পরিচিতির দ্বারাই পাপী মোমেন-মোসলমানদিগকে বাহির করা হইবে। দোযখের আগুন মানুষের সবই ভস্ম করিবে, কিন্তু সেজদার নিশান ভস্ম ও বিকৃত হইবে না। তাহাদিগকে দোযখ হইতে এরূপে বাহির করা হইবে যে, আগুনে পুড়িয়া তাহারা কয়লা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উপর জীবনী-শক্তির পানি বহাইয়া দেওয়া হইবে; ফলে তাহারা সোনালী রঙ্গের রূপ ধারণ করিয়া উঠিবে।"

মোমেন মোসলমান যাহারা নামাযী তাহাদের চেহারায় সেজদার নিশান থাকা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে— سيماهم فى وجوههم من اثر السجود "মোমেনের চেহারায় সেজদার নিশান হইল তাহাদের পরিচয়।" (২৬ পাঃ ১২ রুঃ)

চেহারায় সেজদায় নিশান বলিতে চেহারার উপর নূরের আভাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেজদার পরিমাণ হিসাবে এই আভার পরিমাণও কম-বেশী হয়, এমনকি যাহারা সর্বদা নামাযে অভ্যস্ত তাহাদের এবং বিশেষতঃ যাহারা তাহাজ্জুদ নামাযেও অভ্যস্ত তাহাদের চেহারার সেই আভা ত সচরাচর দৃষ্ট। সেজদার এই আভা আখেরাতের জীবনে অধিক দীপ্ত ও অক্ষয় রেখাপাতকারী হইবে। এমনকি হাশরের মাঠে মোমেনদের সেজদার আভায় তাহাদের সম্পূর্ণ মাথা সূর্য্যের ন্যায় চমকিত হইবে (তফছীর মোজেহুল-কোরআন)। এই আভার বিন্দুও যাহার চেহারায় আছে সে খোদা-নাখাস্তা দোযখের আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া গেলেও তাহার সেই আভাবিন্দু অক্ষয় হইয়া থাকিবে যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে। এই আভাবিন্দুর পরিমাণের তারতম্যে পরিচিতির মধ্যে অবশ্যই আগ-পাছ হইবে। এই তথ্য দৃষ্টে সেজদার সহত্ত্ব সহজেই অনুমেয়। সেজদার নিশান বলিতে বস্তুতঃ নূরের আভা বটে, কিন্তু সেজদার আধিক্যে সৃষ্ট কপালের দাগও সৌভাগ্যের বস্তুই; বিদ্রূপ বা উপেক্ষার বস্তু নহে।

সেজদাবস্থায় উভয় বাহু পাঁজরা হইতে ব্যবধানে রাখিবে

৪৬৮। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেজদাবস্থায় বাহুদ্বয়কে পাঁজরা হইতে এত দূর ব্যবধানে রাখিতেন যে, তাঁহার নূরানী বগল দেখা যাইত।

সাতটি অঙ্গে সেজদা করিতে হইবে

৪৬৯। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করিতে আদেশ করিয়াছেন। (চেহারা, অর্থাৎ) কপালের সঙ্গেই নাককেও বিশেষভাবে ইশারা করিয়া দেখাইয়াছেন, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পায়ের সম্মুখ ভাগ। আরও আদেশ করিয়াছেন যে—কাপড় ও মাথার চুল (সেজদার সময় এলোমেলো হইতে বা ধুলা-বালি হইতে রক্ষা করার জন্য) টানিয়া রাখিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ দ্বারা কয়েকটি মছআলাহ প্রমাণিত হইল—(১) সেজদার মধ্যে কপালের সঙ্গে নাককেও মাটিতে লাগাইতে হইবে এবং উভয় পাও মাটিতে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। ৪৭৫নং হাদীছে আছে যে সেজদাবস্থায় উভয় পা মাটির সঙ্গে এরূপে লাগাইয়া রাখিবে যেন পা-দ্বয়ের আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী হইয়া থাকে। (২) সর্বাঙ্গ ও সর্বস্ব দ্বারা আল্লার হুজুরে সেজদা করিবে—সেই সময় কাপড়, মাথার চুল ইত্যাদির পারিপাট্যের প্রতি কোনই লক্ষ্য রাখিবে না। নতুবা মনে হইবে যেন সেজদার চেয়ে কাপড় ও চুলের পারিপাট্যের মূল্য বেশী।

অবশ্য বোখারী (রঃ) ১১৩ পৃষ্ঠায় একটি মছআলাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছতর খুলিবার আশঙ্কায় কাপড় টানিয়া রাখা বা গিরা ইত্যাদি দিয়া রাখা জায়েয আছে।

৪৭০। হাদীছ ঃ—আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ছাহাবীর নিকট যাইয়া বলিলাম, চলুন; খেজুর বাগানে যাইয়া আমরা নবীজীর (দঃ) হাদীছ আলোচনা করি; সেমতে তিনি চলিলেন। আলোচনায় আমি তাঁহাকে লাইলাতুল-কদর সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, একবার হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজানের প্রথম দশ দিন এ'তেকাফ করিলেন, আমরাও তাঁহার অনুকরণে এ'তেকাফ করিলাম। (দশ দিন গত হইলে পর) জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, আপনি যে রত্নের উদ্দেশ্যে এ'তেকাফ করিয়াছেন (অর্থাৎ লাইলাতুল-কদর) উহা আরও সম্মুখে। তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মধ্যবর্তী দশ দিনেরও এ'তেকাফ করিলেন, আমরাও তদ্রূপ করিলাম। এবারও জিব্রাঈল (আঃ) ঐরূপ বলিলেন। তাই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রমযানের বিশ তারিখের সকাল বেলা আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাহারা আমার সঙ্গে এ'তেকাফরত ছিল তাহারা আরও কিছু দিন এ'তেকাফরত থাকিবে, কারণ লাইলাতুল-কদর শেষ দশ দিনের বে-জোড় রাত্রি সমূহের মধ্যে হইবে। আমাকে আল্লাহ তায়ালা উহা নির্দিষ্ট করিয়া (স্বপ্নে) জানাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি; স্বপ্নের কথা এতটুকু আমার স্মরণ আছে যে, আমি যেন লাইলাতুল-কদরের সকাল বেলা কাদার উপর সেজদা করিতেছি। হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—বিশ তারিখে সকাল বেলায় রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে এরূপ বলিলেন। ঐ দিনটি খুবই পরিষ্কার দিন ছিল, কোন প্রকার বৃষ্টি-বাদলের চিহ্ন দেখা যাইতে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা গেল এবং একুশ তারিখে সারারাত্র বৃষ্টিপাত হইল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে খেজুর পাতার চাল ছিল; তাঁহার নামায স্থানে পানি পড়ায় ঐ স্থান ভিজিয়া গেল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের নামায শেষ করিলে আমি চাক্ষুষ দেখিলাম, তাঁহার কপাল ও নাকের উপর স্পষ্টতঃ কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। (তখন চাক্ষুষরূপে আমরা তাঁহার স্বপ্নকে সপ্রমাণিত বুঝিয়া নিলাম)।

পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ভিজা জায়গার উপর পূর্ণ ও উত্তমরূপে সেজদা করিয়া কপাল ও নাককে কর্দমাক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সেজদা করার নিয়ম

৪৭১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—তোমরা সুন্দররূপে স্থিরতার সহিত সেজদা করিও। সেজদার সময় দুই হাত কুকুরের হাতের ন্যায় জমিনের উপর বিছাইয়া দিও না। (১১৩ পৃঃ)

৪৭২। **হাদীছ ঃ**—মালেক ইবনুল হোয়াইরেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এইরূপ নামায পড়িতে দেখিয়াছেন যে, তিনি প্রথম রাকাতে ও তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবার পর বসিয়া তারপর দাঁড়াইতেন ; সরাসরি দাঁড়াইতেন না। (১১৩ পৃঃ)

প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে সেজদা হইতে দাঁড়াইবার নিয়ম

ব্যাখ্যা ঃ—বয়োপ্রাপ্তি বা অন্য কোন দুর্বলতার অবস্থায় এইরূপ করা সুন্নত তরীকার মধ্যে শামিল। সাধারণ অবস্থাতেও এরূপ করিলে কোন দোষ নাই, কিন্তু না বসিয়া সোজা দাঁড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয়। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ বোখারী শরীফের ৯৮৬ পৃষ্ঠার একটি হাদীছে উল্লেখ আছে এবং এতদ্ভিন্ন ছেহাহ ছেত্তার অন্যান্য কেতাবেও অনেক হাদীছ আছে। ছাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে সচরাচর সাধারণ অবস্থায় তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিয়া বসা হইত না বলিয়া বোখারী শরীফের এই ১১৩ পৃষ্ঠারই মধ্যভাগে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দুই রাকাতের বৈঠক হইতে উঠিতে তকবীর বলিবে

৪৭৩। **হাদীছ ঃ**—সায়ীদ ইবনুল হারেছ (রাঃ) একদা ইমাম হইয়া নামায পড়াইলেন। সেজদায় যাইতে, সেজদা হইতে উঠিতে, দুই রাকআতের বসা হইতে দাঁড়াইতে সশব্দে তকবীর বলিলেন এবং বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।

নামাযের মধ্যে বসিবার নিয়ম

৪৭৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে দেখিলাম, তিনি নামাযের মধ্যে আসন করিয়া বসেন। তাঁহাকে এরূপ করিতে দেখিয়া আমিও এরূপ করিলাম ; তখন আমি যুবক বয়সের। আমার পিতা আমাকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—নামাযের মধ্যে সুন্নত তরীকায় বসা এই যে, ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা মোড়িয়া বসিবে। আমি বলিলাম, আপনি আসন করিয়া বসিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, আমি ওজরবশতঃ এরূপ করিয়া থাকি, কারণ আমার পাদ্বয় মচকিয়া যাওয়ায় উহার উপর সুন্নত তরীকা অনুযায়ী বসা সম্ভব হয় না।

৪৭৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোমায়েদ সায়েদী (রাঃ) একদা বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল তাহা আমি তোমাদের তুলনায় বেশী জানি আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, নামায আরম্ভ করার জন্য যখন তকবীর বলিতেন তখন হস্তদ্বয় কাঁধ পর্য্যন্ত উঠাইতেন (৪৩২নং হাদীছের নোট দেখুন) রুকুতে যাইয়া হস্তদ্বয় হাঁটুর উপর শক্তভাবে রাখিতেন এবং পিঠকে সমতলরূপে ঝুকাইতেন (অর্থাৎ এরূপে রুকু করিতেন যেন পিঠ, কোমর ও মাথা এক বরাবর থাকে।) যখন রুকু হইতে উঠিতেন তখন সোজা হইয়া দাঁড়াইতেন, যেন মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি গিট নিজ নিজ স্থানে বসিয়া যায়। যখন সেজদা করিতেন তখন উভয় হাত জমিনের উপর বিছাইয়াও দিতেন না বা শরীরের

সঙ্গে চিমটাইয়াও রাখিতেন না এবং পায়ের আঙ্গুলসমূহকে মোড়িয়া কেবলামুখী রাখিতেন। যখন দুই রাকাতের পর বসিতেন তখন ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বিছাইয়া দিয়া উহার উপর বসিতেন। যখন শেষ রাকাতে বসিতেন তখন ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পা বাহির করিয়া নিতম্ব জমিনে রাখিয়া বসিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—হানাফী মজহাব মতে নামাযের মধ্যে ডান পা খাড়া রাখিয়া বাম পায়ের উপর বসিবে, নিতম্বকে জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসিবে না, বরং বাম পা বিছাইয়া উহার উপর নিতম্ব রাখিবে—যেরূপ ৪৭৪নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ; নামাযের সব বসাতেই এই নিয়ম। উক্ত নিয়মে বসা অপেক্ষা নিতম্ব জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসাতে শরীর অপেক্ষাকৃত একটু অধিক গুটানো ও সঙ্কুচিত থাকে বিধায় হানাফী মজহাবেও মহিলাদের জন্য নিতম্ব জমিনের সঙ্গে লাগাইয়া বসাকে উত্তম বলা হয় এবং উপরোল্লিখিত নিয়মকে শুধু পুরুষের জন্য উত্তম বলা হইয়াছে। হানাফী মজহাবে নামাযের মধ্যে পুরুষ ও নারীদের জন্য বসিবার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন।

যেই ইমামগণের মজহাবে পুরুষদের জন্যও নিতম্ব জমিনে লাগাইয়া বসার নিয়মকে উত্তম বলা হইয়াছে, যেরূপ ৪৭৫নং হাদীছে বর্ণিত আছে। তাঁহাদের মজহাব মতে নারী-পুরুষ উভয়ের বসার নিয়ম একই হইবে। যেমন ইমাম বোখারী (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী উম্মুদ-দরদা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নামাযের মধ্যে পুরুষের ন্যায়ই বসিতেন এবং তিনি একজন মছলা-মাছায়েল বিশেষজ্ঞা ছিলেন। ফল কথা—প্রত্যেক ইমামের মজহাবেই নারীদের জন্য নিতম্ব জমিনে ঠেকাইয়া বসার নিয়মকে উত্তম বলা হইয়াছে, অবশ্য পুরুষদের জন্য উত্তম নিয়ম সম্পর্কে মতভেদ আছে।

নামাযে বসা অবস্থায় কি পড়িবে ?

৪৭৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম অবস্থায় আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে (নামাযের বৈঠকে) এরূপ বলিতাম—আস্‌সালামু আ'লাল্লাহে, আস্‌সালামু আ'লা জিব্রাঈল, আস্‌সালামু আ'লা মিকাঈল ইত্যাদি ইত্যাদি। একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন—আস্‌সালামু আ'লাল্লাহে (আল্লার জন্য শান্তির দোয়া) বলিও না। আল্লাহ তায়ালাই ত শান্তিদাতা। নামাযে তোমরা এরূপ বলিবে—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝

অর্থ :— "মৌখিক ও শারীরিক এবং হালাল মাল খরচ করতঃ যে সব এবাদৎ করা হয়—সব রকম এবাদৎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। হে প্রিয় নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লার রহমত ও সব রকমের বরকত বর্ষিত হউক। আমাদের উপর এবং আল্লার সমস্ত নেক ও সৎ বন্দা—মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতাগণের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি মনে প্রাণে অঙ্গীকার করিতেছি ও ঘোষণা দিতেছি—আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং ইহাও ঘোষণা দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার বন্দা ও তাঁহার রসুল।" ইহার পর অন্য কোন দোয়া পড়িবে।

এরূপ বলিলে জিব্রাঈল, মিকাঈল সকলেই (শান্তির দোয়ায়) শরীক হইয়া যাইবেন, নাম লইতে হইবে না, অধিকন্তু অন্যান্য সকল সৎ বন্দাগণও শরীক হইবেন।

৪৭৭। **হাদীছ :**—* কায়া'ব ইবনে ওজরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা আরজ করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম ত আল্লাহ তায়ালা (আপনার মুখে আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার প্রতি আপনার আহ্‌লে বাইত সহ ছালাত বা দরুদ কিরূপে পাঠ করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, এইরূপ বলিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى

اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অর্থ—হে আল্লাহ! বিশেষ বিশেষ রহমত বর্ষণ করুন হযরত মোহাম্মদের উপর এবং হযরত মোহাম্মদের আহ্‌লে-বাইত—পরিবার-পরিজনের উপর যেমন আপনি বিশেষ রহমত বর্ষণ করিয়াছিলেন (তাঁহারই পূর্বপুরুষ) হযরত ইব্রাহীমের উপর এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনার সমুদয় কাজই প্রশংসনীয়, আপনি অতি মহান।

---

* এই হাদীছে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটি সামান্য একটু শব্দগত বিভিন্নতার সহিত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) আবু হোমায়েদ সায়েদী (রাঃ) হইতেও বর্ণিত আছে এবং ছাহাবীত্রয়ের হাদীছ তিনটি ইমাম বোখারী (রঃ) তিন স্থানে বয়ান করিয়াছেন—(১) নবীদের ইতিহাস অধ্যায়ে—হযরত ইব্রাহীমের বয়ান, (২) তফছীর অধ্যায়ে—ছুরা আহযাবের তফছীর, (৩) দোয়ার অধ্যায়ে—হযরতের প্রতি দরুদের বয়ান।

নামাযের অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) এই হাদীছটি উল্লেখ করেন নাই, আমরাও চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত এস্থলে এই হাদীছ খানা উল্লেখ করিয়াছিলাম না। ইতিমধ্যে কোন কোন পাঠকের পত্রে তাহার বিভ্রান্তির সংবাদে উক্ত প্রথমস্থানে বর্ণিত হাদীছ খানা এস্থানে বয়ান করিয়া দেওয়া হইল।

আয় আল্লাহ! বরকত, কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন হযরত মোহাম্মদকে এবং হযরত মোহাম্মদের পরিবার-পরিজনকে, যেমন বরকত দান করিয়াছিলেন (তাঁহারই পূর্বপুরুষ) হযরত ইব্রাহীমকে এবং হযরত ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনকে, নিশ্চয় আপনার সমুদয় কাজই প্রশংসনীয়, আপনি অতি মহান।

ব্যাখ্যা ঃ—আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন—

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ দরুদ (বিশেষ রহমত) পাঠাইয়া থাকেন এবং ফেরেশতাগণ দরুদ (বিশেষ রহমতের দোয়া) পড়িয়া থাকেন নবী—মোহাম্মদের প্রতি; হে মোমেনগণ। তোমরাও দরুদ (রহমতের দোয়া) পাঠ কর তাঁহার প্রতি এবং বিশেষ সালাম পাঠ কর।"

উক্ত আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক হযরতের প্রতি দরুদ ও সালাম অন্ততঃ একবার পাঠ করা প্রত্যেক মোসলমানের উপর ফরজ। তার অধিক সর্বদার জন্য পাঠ করা অতিশয় ফজিলতের কাজ এবং সুন্নত, বিশেষতঃ নামাযের শেষ বৈঠকে। যেহেতু স্বয়ং হযরত (দঃ) আত্তাহিয়্যাতুর সঙ্গে তাঁহার প্রতি সালাম পাঠ শিক্ষা দিয়াছেন এবং ঐ সালাম শিক্ষা দেওয়াকে উপলক্ষ করিয়াই ছাহাবীগণ "ছালাত" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাও উল্লেখিত-রূপে শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সালাম ও ছালাত উভয়টিই বিশেষরূপে নামাযের মধ্যে প্রযোজ্য থাকিবে। অধিকন্তু উক্ত ছালাত বা দরুদ শিক্ষা দান নামায সম্পর্কে ছিল বলিয়া অনেক হাদীছেও স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। (ফতহুলবারী ১১—১৩৬)

সালামের পূর্বে দোয়া করিবে

৪৭৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযের মধ্যে (আত্তাহিয়্যাত ও দরুদের পরে) এই দোয়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ۔

"হে আল্লাহ! আমি কবরের আজাব হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, অসৎ দজ্জালের ধোকা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর সময় সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর, আপনি ঋণ হইতে বিশেষ ও অধিকরূপে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয় তখন কথা বলিতে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করিয়া উহা ভঙ্গ করে। (অর্থাৎ ঋণ অতি জঘন্য যাহা অনেক গোনাহের কারণ হয়।)

৪৭৯। **হাদীছ ঃ**—আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন—আমাকে একটি দোয়া শিক্ষা দেন যাহা আমি নামাযের মধ্যে পাঠ করিব। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, বলে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ ঃ—হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অত্যধিক অত্যাচার (গোনাহ) করিয়াছি; একমাত্র তুমি ভিন্ন কেহ গোনাহ মাফ করিতে পারে না। তুমি স্বীয় করুণাবলে আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং আমার উপর রহম কর; একমাত্র তুমিই ক্ষমাকারী।

মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সালাম করিবে

৪৮০। **হাদীছ ঃ**—এত্বান ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি, হযরত (দঃ) যখন সালাম ফিরিয়াছেন আমরাও তখনই সালাম ফিরিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত হাদীছ দ্বারা বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ বলিয়াছেন যে, মোক্তাদী ইমামের সঙ্গে সঙ্গেই সালাম ফিরিবে (অতিরিক্ত দোয়া-দরুদে লিপ্ত হইয়া সালাম ফিরিতে বিলম্ব করিবে না।) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বোখারী (রঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমামের সঙ্গেই মোক্তাদীদের সালাম ফেরাকে তিনি মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহও বর্ণনা করিয়াছেন যে, মোক্তাদীকে দুই সালামই করিতে হইবে; যেরূপ ইমাম দুই সালাম করিয়া থাকেন।

নামাযান্তে আল্লার জিক্‌র করা

৪৮১। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফরজ নামাযান্তে সশব্দে "আল্লাহু-আকবার" জিক্‌র করা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে ছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—উহা দ্বারা আমি নামায শেষ হওয়া উপলব্ধি করিতাম।

৪৮২। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা দরিদ্র শ্রেণীর লোকগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হাজির হইয়া এই অনুতাপ

প্রকাশ করিল যে, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ধন-দৌলত আল্লার রাহে খরচ করিয়া বড় বড় মর্তবা ও অফুরন্ত নেয়ামতসমূহের অধিকারী হইতেছে। কারণ, তাহারা আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, রোযা রাখে, তাছাড়া তাহাদের বেশী ধন-দৌলত আছে, যদ্দারা তাহারা হজ্জ, ওমরা ও জেহাদ করিয়া থাকে এবং ছদকা-খয়রাত করিয়া থাকে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে এমন ব্যবস্থা ও আমল শিক্ষা দান করিব যদ্দারা তোমরা অগ্রগামী ব্যক্তিগণের সমান হইতে সক্ষম হইবে এবং তোমরা সর্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ঐ ব্যবস্থা ও আমল অবলম্বন ব্যতীত কেহই তোমাদের বরাবর হইতে পারিবে না। (সেই আমলটি হইল—)

প্রতি নামাযের পর ছোবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আল্‌হামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পড়িবে।

ব্যাখ্যা ঃ— মোসলেম শরীফের রেওয়ায়েতে এই হাদীছের সঙ্গে আরও একটু অংশ উল্লেখ হইয়াছে যে, কিছু দিন পর দরিদ্র শ্রেণীর লোকগণ পুনরায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, আপনি আমাদিগকে যেই বিশেষ ব্যবস্থা ও আমল শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, আমাদের ধনাঢ্য ভাইগণ উহার খোঁজ পাইয়া তাঁহারাও উহা অবলম্বন করিয়াছেন। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, নেক আমলের তৌফিক ও সামর্থ্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ মেহেরবানী ও দয়া; আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা দান করিয়া থাকেন। (সে বিষয়ে মানুষের কিছু করার ক্ষমতা নাই; মানবের একমাত্র কর্তব্য হইল—স্বীয় শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সাধনা করিয়া যাওয়া।)

৪৮৩। হাদীছ ঃ—মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতি নামাযের পর এই দোয়া পড়িতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ

وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ

لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

অর্থ ঃ—একমাত্র আল্লাহ-ই মা'বুদ, তাঁহার কোন শরীক নাই, সমস্ত রাজত্ব ও প্রভুত্ব একমাত্র তাঁহারই, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই, তিনিই জীবনদাতা, জীবন রক্ষক ও মৃত্যুদাতা এবং সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাহা দান করিবে তাহা কেহ বন্ধ করিতে পারে না, তুমি যাহা না দিবে তাহা কেহ দিতে পারে না। তুমি দান না করিলে ভাগ্যবানের ভাগ্যও তাহার কোন উপকার করিতে পারে না।

নামাযান্তে ইমামের ডান বা বাম দিকে অথবা মোক্তাদীমুখী বসা

৪৮৪। **হাদীছ ঃ**—সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায শেষে আমাদের প্রতি মুখ করিয়া বসিতেন।

৪৮৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন স্বীয় নামাযের এক অংশ শয়তানকে দান না করে ; এইরূপে যে, নামাযের পর ডান দিকে ঘুরিয়া যাওয়া জরুরী মনে করে। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনেক সময় বাম দিকেও ফিরিতে দেখিয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ—ঘৃণার কাজ ব্যতীত প্রত্যেক কাজেই বাম দিক অবলম্বন অপেক্ষা ডান দিক উত্তম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই "উত্তম"কে যদি কেহ জরুরী ও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করে তবে উহা শরীয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপের শামিল হইবে। তাই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এখানে কঠোর ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। তদুপরি যে বিষয়কে জরুরী বলিয়া ধার্য্য করে নাই যদিও উহা উত্তম হয়, কিন্তু উত্তমকে জরুরী মনে করা শরীয়তের বিধান বহির্ভূত হওয়ায় উহা শয়তানের কারসাজি বলিয়াই গণ্য হইবে।

দুর্গন্ধময় বস্তু খাইয়া মসজিদে যাওয়া নিষেধ

৪৮৬। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি পেয়াজ বা রসুন (ইত্যাদি দুর্গন্ধময় বস্তু) ব্যবহার করিয়াছে সে যেন মসজিদের নিকটেও না আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামায না পড়ে। সে যেন মসজিদ হইতে দুরে থাকে। জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, মনে হয়— এস্থলে কাঁচা পেয়াজ-রসুনই উদ্দেশ্য এবং নিষেধাজ্ঞা উহার দুর্গন্ধের কারণে। জাবের (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে একটি পাত্রে খাদ্য উপস্থিত করা হইল যাহাতে (রসুন এবং উহার ন্যায় গন্ধময় "কর্‌রাছ" ইত্যাদি) বিভিন্ন তাজা সবজি (কুচিকাটারূপে) মিশ্রিত ছিল। হযরত (দঃ) উহার গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সবজিগুলির নাম বলা হইল ; তখন হযরত (দঃ) এই খাদ্য তাঁহার অন্য এক সঙ্গীর সম্মুখে দেওয়ার জন্য বলিলেন। হযরত (দঃ) উহা গ্রহণ না করায় ঐ ব্যক্তি উহা গ্রহণে অসম্মত হইল। এতদ্‌দৃষ্টে হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি খাও। আমার কথাবার্তা এমন জনের সঙ্গে হয় যাহার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয় না (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সঙ্গে)।

৪৮৭। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খায়বার যুদ্ধের সময়ে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রসুন জাতীয় সবজি যে ব্যক্তি খাইবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে।

৪৮৮। **হাদীছ ঃ**—এক ব্যক্তি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, রসুন সম্পর্কে আপনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কি বলিতে শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, এই জাতীয় সবজি যে ব্যক্তি খাইয়াছে, সে যেন আমাদের নিকটে না আসে এবং আমাদের সঙ্গে নামায না পড়ে।

ব্যাখ্যা ঃ—৪৮৬নং হাদীছে ছাহাবী জাবের (রাঃ) স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, দুর্গন্ধের জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা। বিড়ি-সিগারেট ও হোক্কার দুর্গন্ধ যে কিরূপ তাহা সকলেই জানে, অতএব উহার অভ্যস্ত ব্যক্তিরা মসজিদে আসিবার পূর্বে উহা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে।

নারীদের মসজিদে যাওয়া

৪৮৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—কাহারও স্ত্রী যদি রাত্রির অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তবে তাহাকে অনুমতি দেওয়া চাই।

ব্যাখ্য ঃ—এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, নারীদের জন্য মসজিদে যাইতেও স্বামীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক ছিল।

৪৯০। **হাদীছ ঃ**— উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে নারীগণ মসজিদে উপস্থিত হইত এবং সালাম ফিরা মাত্র বাহির হইয়া আসিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং পুরুষগণ বসিয়া থাকিতেন। (মহিলাগণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এরূপ অনুমান করিয়া) রসুলুল্লাহ (দঃ) দাঁড়াইলে পর পুরুষগণ দাঁড়াইতেন; এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) (এবং পুরুষগণ) মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই নারীগণ নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া সারিত। (১১৭ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছ দৃষ্টে বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, নারীদের জন্য মসজিদে অবস্থান সংক্ষিপ্ত করার এবং নামায হইতে দ্রুত বাড়ী প্রত্যাবর্তন করার আদেশ ছিল। এই হাদীছে ইহাও সুস্পষ্ট যে, শুধু মাত্র মসজিদ-সংলগ্ন বাড়ী-ঘরের নারীরাই মসজিদে আসিত।

৪৯১। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বর্তমান যুগের নারীরা যে অবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা যদি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জানিতেন তবে খোদার কসম—নিশ্চয় তিনি নারীগণকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন, যেরূপভাবে বনী ইস্রায়ীলের নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—আয়েশা (রাঃ) যেই যুগের নারীগণের প্রতি অভিযোগ করিতেছিলেন সেই নারীগণ হইলেন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার যুগের নারী, অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সংলগ্ন যুগ, সেই যুগের পরেও উত্তম যুগ আরও একটি বা দুইটি বাকি ছিল। সেই যুগ হইতে দীর্ঘ তেরশত বৎসরের অধিক কাল পরের যুগ হইল বর্তমান যুগ। এই যুগের নারীদের অবস্থা আয়েশা (রঃ) দেখিলে কি বলিতেন? এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহা জানিতে পারিলে কি করিতেন? উহা পাঠকগণের বিবেক-বুদ্ধির উপরই ছাড়া হইল।

২৯২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের এক স্ত্রী (রাত্রের অন্ধকারে) ফজর ও এশার নামাযের জমাতে মসজিদে যাইতেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আপনি কেন মসজিদে আসেন? অথচ জানেন যে, ওমর (রাঃ) ইহা নাপছন্দ করেন এবং ইহাতে ক্ষুব্ধ হন। স্ত্রী বলিল, ওমর (রাঃ) আমাকে (নিষেধ করেন না কেন?) নিষেধ করিতে বাধা কি? ঐ ব্যক্তি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ—"আল্লার বান্দাগণকে আল্লার মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না।" (এই হাদীছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন) ওমর (রাঃ)কে প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞায় বাধা দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ—হাদীছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্যে ছাহাবীগণ নারীদের মসজিদে যাওয়ার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার আইন প্রয়োগ করিতেন না, কিন্তু যুগের পরিবর্তনে সকলেই উহাকে অবাঞ্ছিত গণ্য করিতেন। নারীদের মসজিদে বা ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কে জরুরী ও অধিক আলোচনা "ঋতুবতীর জন্য ঈদগাহে ও দোয়ার সমাবেশে উপস্থিত হওয়া" পরিচ্ছেদে ২২২নং হাদীছের ব্যাখ্যায় রহিয়াছে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ঝড়-তুফান বা প্রবল বৃষ্টিপাত ইত্যাদির সময় মসজিদে বা জমাতে উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই। নিজ গৃহে নামায পড়িয়া নিবে (৯২ পৃঃ ৩৮৫ হাদীছ)।

● লোকদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে নামাযের নিয়ম দেখাইবার নামায পড়া জায়েয আছে (৯৩ পৃঃ ৪৬৬ হাদীছ)। এইরূপ উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে উক্ত নামায প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যই গণ্য হইবে এবং উহাতে ছওয়াব লাভ হইবে।

● কোন মোক্তাদী যদি বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ ইমামের পার্শ্বে দাঁড়ায়; (মোক্তাদীদের কাতারে শামিল হইলে সেই প্রয়োজন মিটে না,) তাহা জায়েয হইবে (৯৪ পৃঃ ৪০৩ হাদীছ)।

● রাষ্ট্রপ্রধান যেখানেই যাইবেন তথায়ই তিনি ইমামতী করিবেন (৯৫ পৃ)।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলেম শরীফের এক হাদীছে আছে, "কাহারও প্রাধান্যের স্থানে অন্য আগন্তুক ব্যক্তির ইমাম হওয়া চাই না।" উক্ত হাদীছ বর্ণনা করিয়াই বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রপ্রধানের প্রাধান্য যেহেতু সর্বত্র ও সকলের উপর তাই তিনি সর্বাস্থলেই ইমাম হইবেন। সেমতে একস্থানে কাহারও প্রাধান্য রহিয়াছে সেখানে যদি তাঁহার উপর প্রাধান্যের অধিকারী কেহ উপস্থিত হন, তবে ইমামতীর জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা উচিত।

● মোক্তাদী শুধু একজন পুরুষ হইলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইবে। সে ক্ষেত্রে ইমামের বরাবর সমরেখা পর্য্যন্ত অবশ্যই থাকিতে হইবে (৯৭ পৃঃ ১০৯ হাদীছ)। সামান্য পরিমাণেও ইমাম হইতে অগ্রে হইলে মোক্তাদীর নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে। অগ্র হওয়ার আশঙ্কামুক্ত থাকার জন্য সামান্য পেছনে থাকা ভাল।

● মোক্তাদী একজন, সে ইমামের বাম দিকে দাঁড়াইলে যদি ইমাম নামাযের মধ্যেই তাহাকে ধরিয়া ডান দিকে নিয়া আসে, তাহাতে ইমাম মোক্তাদী কাহারও নামায নষ্ট হইবে না (৯৭ পৃঃ)। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবে যে, মোক্তাদীকে ইমামের পেছন দিক দিয়া আনিবে এবং এমনভাবে আনিবে যাহাতে তাহার কেবলামুখী থাকা ভঙ্গ না হয়, অন্যথায় মোক্তাদীর নামায ফাছেদ হইয়া যাইবে।

● কোন ব্যক্তি স্বীয় নামায আরম্ভ করিয়াছে ইমামতীর নিয়্যত করে নাই, তাহার সহিত পুরুষলোক একতেদা করিলে ইমাম মোক্তাদী সকলেরই নামায শুদ্ধ হইবে (৯৭ পৃঃ)। অবশ্য ইমামতীর যে বিশেষ ছওয়াব আছে তাহা লাভ করার জন্য ইমামতীর নিয়্যত করা আবশ্যক; প্রথম হইতে যদি কোন মোক্তাদী উপস্থিত না থাকে, তবে যখন মোক্তাদী আসে তখন মনে মনে ইমামতীর নিয়্যত তথা ইচ্ছা করিয়া নিবে। (শামী, ১-৩৯৫)

পুরুষ ইমামের সহিত মহিলার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ভিন্ন মছআলাহ। সে ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য মতামত ইহাই যে, পুরুষ ইমাম বিশেষরূপে মহিলার ইমামতীর নিয়্যত যদি না করে তবে সেই ইমামের পেছনে মহিলার নামায হইবে না (শামী, ১—৫৩৯)। সেমতে মহিলারা যদি মসজিদে নামায পড়ে তবে এই ব্যাপারে তাহাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

● ইমামতীর সময় কেরাত, রুকু-সেজদা ইত্যাদি অতি দীর্ঘ করিবে না, কিন্তু রুকু-সেজদা পূর্ণরূপে অবশ্যই করিবে (৯৭ পৃঃ ৭৬ হাদীছ)।

● (বিভিন্ন নামাযে কেরাতের যে পরিমাণ সুন্নত নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহার অধিক পড়িয়া বা প্রয়োজনাতিরিক্ত মন্থর ও ধীর গতিতে পড়িয়া) ইমাম নামায লম্বা করিলে মোক্তাদী ইমামের প্রতি অভিযোগ করিতে পারে (৯৭ পৃঃ)।

● ইমামের তকবীর সব মোক্তাদী শুনিতে পারিবে না বিধায় কোন মোক্তাদী কর্তৃক ইমামের সঙ্গে তকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলা মোকাব্বের হওয়া জায়েয আছে (৯৮ পৃঃ ৪০৩ হাঃ)।

মছআলাহ:—যে সব মোক্তাদী এমন স্থানে দাঁড়ায় যেস্থান হইতে তাহারা ইমামের রুকু-সেজদা, উঠা-বসা সরাসরি অবগত হয় না সে ক্ষেত্রে ঐ মোক্তাদীগণ পরস্পর অন্য মোক্তাদীর অনুসরণে নামায আদায় করিবে এবং তাহাদের নামায শুদ্ধ হইয়া যাইবে (৯৯ পৃঃ ৪০৩ হাদীছ)।

অবশ্য ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই হইবে যে, আরকান আহকাম আদায়ে ইমামের সহগমন যেন রক্ষা হয় এবং রুকু-সেজদার ব্যাপারে ইমামই একমাত্র অনুসরণীয়। সুতরাং ঐরূপ দূরের কাতারে কোন মোক্তাদী যদি এমন সময় নামাযে শরীক হইয়া রুকুতে যায় যখন ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পেছনের মোক্তাদীগণ হয়ত তখন রুকুতে ছিল; এরূপ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি উক্ত রাকাত পাইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে না। অতএব যে স্থান হইতে ইমামের অবস্থা সরাসরি প্রত্যক্ষ না হয় ঐরূপ স্থানে সঙ্কীর্ণ অবস্থায়

রুকুতে শরীক হইয়া উক্ত রাকাত প্রাপ্তি গণ্য করা অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়; ইমামের সঙ্গে রুকু প্রাপ্তির সন্দেহ ক্ষেত্রে রুকুতে শামিল না হওয়া চাই।

● নামায অবস্থায় বা নামায শেষে মোক্তাদী কর্তৃক ইমামের ভুল ধরা হইলে বা কোন বিষয়ে ইমামের সন্দেহ হইলে সে ক্ষেত্রে ইমাম মোক্তাদীর কথা গ্রহণ করিবে।

● সাধারণতঃ ইমামের ডান দিক এবং মসজিদের ডান দিকের ফজিলত অধিক (১০১ পৃঃ)। আবু দাউদ শরীফে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কাতার সমূহের ডান অংশের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত হয়, ফেরেশতাদেরও বিশেষ দোয়া হয়।

অবশ্য সম্মুখ কাতারের যে কোন অংশে জায়গা খালি থাকিলে পেছনে দাঁড়ান গোনাহ সুতরাং কাতারে খালি জায়গা দেখিয়া বাম দিকে হওয়া সত্ত্বেও উহা পূর্ণ করার তৎপর হইলে ইহারও বিশেষ ফজিলত রহিয়াছে। ইবনে মাজা শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, মসজিদের বাম দিক খালি থাকিয়া যায়। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, মসজিদের বাম দিকস্থ অংশের খালি জায়গা পূরণে যে ব্যক্তি তৎপর হইবে সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে (ফতঃ ২-১৬৯)।

● নামায আরম্ভ করিতে হস্তদ্বয় উত্তোলন এবং তকবীর বলা উভয়ই এক সঙ্গে পরিচালিত করিবে (১০২ পৃঃ ৪৩২ হাদীছ)।

● সেজদা অবস্থায় পা এইরূপে খাড়া রাখিবে যেন পায়ের আঙ্গুল মোড়িয়া কেবলামুখী হইয়া থাকে (১১২ পৃঃ ৪৭৫ হাদীছ)।

● নামাযের মধ্যে ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে কাপড় সংযত রাখায় তৎপর হওয়া জায়েয (১১৩ পৃঃ ২৫০ হাদীছ)।

● নামাযের মধ্যে চুলের ভাজ ভাঙ্গিলে বা এলোমেলো হইলে নামাযের মধ্যেই উহা প্রতিরোধে লিপ্ত হইবে না (১১৩ পৃঃ ৪৬৯ হাদীছ)।

● প্রত্যেক রাকাতে উভয় সেজদার মধ্যেও শান্তভাবে বসিয়া তারপর দ্বিতীয় সেজদায় যাইবে (১১৩ পৃঃ)।

● কপাল, নাক ইত্যাদিতে ধূলা-বালু লাগিলে নামাযের মধ্যেই উহা পরিস্কার করায় লিপ্ত হইবে না (১১৫ পৃ ৪৭০ হাদীছ)।

● নামায পড়িয়াই ইমামকে নামাযের স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এমনকি ইমাম এবং যে কোন মুছল্লী তাহার ফরজ নামাযের স্থান হইতে মোটেও না সরিয়া সেই স্থানেই সুন্নত ও নফল ইত্যাদি নামায পড়িতে পারে; ইহাতে কোন দোষ নাই। বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফরজ পড়িয়া ঐ স্থানেই অন্য নামায পড়িতেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্র বিশিষ্ট তাবেয়ী কাসেম (রঃ)ও ঐরূপ করিতেন।

ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি হাদীছ আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর নামে বর্ণনা করা হইয়া থাকে যে, ইমাম তাহার ফরজ, পড়ার স্থানে সুন্নত-নফল নামায পড়িবে না। এই হাদীছ বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত নহে (১১৭ পৃঃ)। তবে এই ব্যাপারে একাধিক হাদীছ রহিয়াছে; অবশ্য উহার প্রত্যেকটি হাদীছেরই সনদ তথা সাক্ষ্য-সূত্র দুর্বল। অতএব উহাকে ভাল বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহার বিপরীতটা মকরূহ সাব্যস্ত হইবে না। সুতরাং উহার জন্য অধিক তৎপরতা বা অন্যের উপর চাপ প্রয়োগ নিতান্তই বাড়াবাড়ি গণ্য হইবে।

● অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার উপর নামায ফরজ নহে, তদ্রূপ অজুও তাহাদের উপর ফরজ নহে, (শামী, ১—৮০)। অবশ্য তাহাদেরও নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য নামায শুদ্ধের সমুদয় শর্ত বজায় থাকিতে হইবে। বালক-বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে নামাযে অভ্যস্ত করা চাই; তখন নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত পালনে এবং নামায নষ্ট হওয়ার কোন কারণ হইলে তদ্দরুন ঐ নামায পুনঃ পড়ায়ও তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিবে (শামী, ১—৩৮৩)। অজু গোসল একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই ফরজ হইবে (ফতহুল-বারী, ২—২৭৫)। বালকদের মসজিদে এবং ঈদগাহে যাওয়ায়ও অভ্যস্ত করিবে। অবশ্য দুইটি বিষয় সতর্ক থাকিবে—পাক-পবিত্র হওয়া এবং মসজিদের ও ঈদগাহের আদব-কায়দা রক্ষা করা তথা খেলা-ধুলা ও হট্টগোল হইতে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা (১১৮ পৃঃ)।

——)*(——

জুমার দিন ও নামাযের আহকাম

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ.....

অর্থ :—হে মোমেনগণ! জুমার দিন জুমার নামাযের আজান দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য (ইত্যাদি লিপ্ততা) ত্যাগ পূর্বক আল্লার জিকর তথা নামাযের প্রতি ধাবিত হও। তোমাদের যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকে তবে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর। (২৮ পাঃ ১১ রুকু)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা হারাম। আ'তা (রাঃ) বলিয়াছেন, জুমার আজানের পর শিল্পকার্য্যও হারাম। ইমাম যুহরী বলিয়াছেন, জুমার আজান হইলে (অবস্থানরত) মুসাফিরও জুমার নামাযে উপস্থিত হইবে। (১০৪ পৃঃ)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় একদা জুমার দিন এক দল লোক খোৎবার সময় খাদ্য ক্রয়ের সুযোগের প্রতি ধাবিত হইলে তাহাদের কটাক্ষ করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছিল। নিম্নের হাদীছে উহারই বিবরণ আছে।

৪৯৩। **হাদীছ** :—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জুমার দিন আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত নামাযের জন্য একত্রিত হইয়াছিলাম। ঐ সময় একটি সওদাগরী দল আসিতেছিল; উপস্থিত লোকদের অনেকেই সেই দিকে ধাবিত হইল; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে শুধু বারজন লোক বাকি থাকিলেন। সেই ব্যাপারেই এই আয়াত নাযেল হইল—

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا

"এক শ্রেণীর লোক তাহারা যখন ব্যবসা বা তামাশার সুযোগ দেখিল, উহার প্রতি ধাবমান হইল— (খোৎবা দানে) দণ্ডায়মান অবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে। তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আল্লার নিকট (সন্তুষ্টি ও ছওয়াব) আছে তাহা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রং-তামাশা অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং আল্লাহ সর্বোত্তম আহার যোগানদাতা। (১২৮ পৃঃ)

ব্যাখ্যা :—জুমার আজানের সঙ্গে সঙ্গে খরিদ-বিক্রি ইত্যাদি লিপ্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান এবং পূর্ণ খোৎবার সময় তথায় জমিয়া থাকার বিশেষ আদেশ পূর্বে বিজ্ঞাপিত হয় নাই; সে সম্পর্কের পূর্বোল্লিখিত আয়াতও নাযেল হইয়াছিল না। এবং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে—আলোচ্য ঘটনার সময়কালে জুমার খোৎবা নামাযের পরে হইত—

যেরূপ ঈদের নামাযে এখনও হইয়া থাকে। তাই ছাহাবীগণ মূল নামায সমাপ্ত হওয়া দেখিয়া বিলম্বে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় খাদ্যক্রয়ে ছুটিয়া গিয়াছিলেন; তখন মদীনায় খাদ্যের অভাব ছিল। অতঃপর খোৎবা নামাযের পূর্বে হওয়ার বিধান আসে এবং মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হওয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য কর্তন করার আদেশের আয়াতও নাযেল হয়। এই আয়াতে পূর্বের ঘটনার প্রতি কটাক্ষ করা হয়; উক্ত কটাক্ষের পরে ছাহাবীরা এরূপ সংশোধনই হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদেরই অবস্থার চিত্রাঙ্কনে নেক লোকদের গুণরূপে আল্লাহ বলিয়াছেন—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوٰةِ - يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"এমন লোকগণ যাহাদেরে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় আল্লার জিকর তথা স্মরণ হইতে এবং পূর্ণাঙ্গ নামায পড়া ও জাকাত দেওয়া হইতে অন্য-মনা করিতে পারে না। তাহারা ঐ দিনের ভয় রাখে যেদিন লোকদের কলিজা ও চক্ষু উল্টিয়া যাইবে। (১৮ পাঃ ১১ রুকু)

৪৯৪। **হাদীছ**:—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—অন্যান্য নবীগণের উম্মতদিগকে আল্লার কেতাব আমাদের পূর্বে দেওয়া হইয়াছে—ইহুদীগণকে তওরাত, নাছারাগণকে ইঞ্জীল। (অর্থাৎ জগতে তাহাদের আবির্ভাব আমাদের পূর্বে ছিল;) আমরা দুনিয়াতে তাহাদের পর আবির্ভূত হইয়াছি, কিন্তু কেয়ামতের দিন আমরা সর্বাগ্রে থাকিব। আমাদের আর একটি ফজিলত এই যে, আল্লাহ তায়ালা পূর্বের উম্মতগণকে প্রতি সপ্তাহে একটি দিন বিশেষরূপে এবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইবার আদেশ করিয়াছিলেন এবং আল্লার নিকট জুমার দিনটিই ঐ দিনরূপে পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মত ইহুদীগণ ইহার পরের দিন অর্থাৎ শনিবার এবং নাছারাগণ তাহার পরের দিন রবিবারকে বাছিয়া লয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি মেহেরবান হইয়া স্বীয় পছন্দনীয় ঐ জুমার দিনটিকে আমাদের জন্য নিজেই মনোনীত করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা:—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত এই ছিল যে, স্বীয় পছন্দনীয় দিনটিকে তিনি নিজেই প্রকাশ্যে তাহাদের জন্য নির্বাচিত করিয়া দেন। তদুপরি এই উম্মতের বিবেক বুদ্ধিকেও তাঁহার পছন্দ অনুযায়ী পরিচালিত করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হিজরতের পূর্বেই মদীনাবাসী কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছু মোসলমান মক্কা হইতে মদীনাতে হিজরত করিয়াও আসিয়াছিলেন। তখনও কোরআন শরীফে জুমার দিন বা জুমার নামাযের বিষয়ে কোন আয়াত নাযেল হয় নাই; কিন্তু মদীনার তৎকালীন

মোসলমানগণ সপ্তাহে একটি দিনকে বিশেষরূপে এবাদতের জন্য নির্বাচন করিতে মনস্থ করিলেন। আল্লার মেহেরবানী—তাঁহাদের পরামর্শে এই জুমার দিনটিই নির্বাচিত হইয়াছিল।

জুমার দিনে গোসল করা

৪৯৫। **হাদীছ :—** আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেকেরই জুমার নামাযে উপস্থিত হইবার পূর্বে গোসল করা আবশ্যক।

৪৯৬। **হাদীছ :—**ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রাঃ) জুমার নামাযের খোৎবা দিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, একজন মোহাজের ছাহাবী জুমার নামাযের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, জুমার উপস্থিত হইবার সময় কি এখন? ছাহাবী উত্তর করিলেন, আমি একটি কাজে লিপ্ত ছিলাম, তাই আজানের পূর্বে বাড়ী ফিরিতে পারি নাই; এই মাত্র বাড়ী ফিরিয়া আজান শুনিলাম এবং অজু করিয়া উপস্থিত হইলাম। খলীফা ওমর (রাঃ) আশ্চর্যান্বিতরূপে বলিয়া উঠিলেন, (গোসল ব্যতিরেকে) শুধু অজু করিয়া আসিলেন? অথচ আপনি জানেন যে, হযরত (দঃ) আমাদিগকে (জুমার দিন) গোসল করিতে আদেশ করিতেন।

৪৯৭। **হাদীছ :—**তাউস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, লোকেরা বর্ণনা করে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা জুমার দিন গোসল করিবে, ভালরূপে মাথা ধুইবে যদিও ফরজ গোসলের নাপাক না হও এবং সুগন্ধী ব্যবহার করিবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, গোসল সম্পর্কে আমারও এই আদেশ জানা আছে; সুগন্ধী সম্পর্কে আদেশ আমার জানা নাই। (১২১ পৃঃ)

৪৯৮। **হাদীছ :—**ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (রঃ) আম্‌রাহ (রঃ)কে জুমার দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বর্ণনা করিলেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (নবী আলাইহেচ্ছালামের যুগে) লোকদের (অভাব-অনটনের দরুন চাকর রাখার সামর্থ্য ছিল না, তাই) পরিশ্রমের কাজ-কর্মও নিজেদেরই করিতে হইত। (একদিকে সেই খাটুনি, অপরদিকে তাহাদের পরিধেয় ছিল দুম্বা-বকরীর লোমের তৈরী মোটা কম্বল; সুতরাং তাহাদের ঘর্মাক্ত শরীরে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হইত;) সেই অবস্থায়ই তাহারা জুমার নামাযে আসিত; তাই তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল—যদি তোমরা গোসল করিয়া জুমার নামাযে আস তবে ভাল হয়। (১২৩ পৃঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আবু দাউদ শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও এইরূপ একটি বর্ণনাই বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে উক্ত বিবরণী দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, জুমার দিন গোসল করা বিধানগত ওয়াজেব নহে, বরং পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

জুমার দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা

৪৯৯। **হাদীছ ঃ**— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর জুমার দিন গোসল করা ওয়াজেব* (তথা বিশেষ প্রয়োজনীয় উত্তম কাজ) এবং মেছওয়াক করিবে এবং সামর্থ্য হইলে সুগন্ধি ব্যবহার করিবে।

৫০০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি উত্তমরূপে গোসল করিয়া যথাসত্বর আউয়াল ওয়াক্তে জুমার নামাযের জন্য উপস্থিত হইবে সে (এত ছওয়াবের ভাগী হইবে) যেন একটি উট কোরবাণী করিয়াছে। তারপরের সময়ে যে আসিবে সে যেন একটি গরু কোরবাণী করিয়াছে। তারপর সময়ে যে আসিবে সে যেন একটি দুম্বা কোরবাণী করিয়াছে। তারপরের সময়ে যে আসিবে যে যেন একটি মোরগ কোরবাণী (অর্থাৎ আল্লার রাস্তায় ছদকা) করিয়াছে। তারপর পঞ্চমাংশে যে আসিয়াছে সে যেন একটি আণ্ডা ছদকা করিয়াছে। (ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত এইরূপে শ্রেণী বিভক্ত হইবে;) তারপর যখন ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হইবেন তখন ফেরেশতাগণ (ঐ বিশেষ ছওয়াব লেখা ক্ষান্ত করিয়া খোৎবার মধ্যে) আল্লার জিকর শুনিবার জন্য মসজিদে চলিয়া আসেন।

জুমার দিন তৈল ব্যবহার করা

৫০১। **হাদীছ ঃ**—সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করিবে, সাধ্যানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে এবং তৈল ব্যবহার করিবে অথবা নিজ ঘরে যদি সুগন্ধির ব্যবস্থা থাকে তবে উহা ব্যবহার করিবে, তারপর মসজিদে উপস্থিত হইয়া যেখানে স্থান পায় সেখানেই বসিয়া পড়িবে, কাহাকেও কষ্ট দিয়া মধ্যস্থলে বসিবে না, তারপর যথাসাধ্য নামায পড়িবে, ইমামের খোৎবা দানকালে চুপ থাকিবে—ঐ ব্যক্তির এক সপ্তাহের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

জুমার দিন ভাল জামা-কাপড় পরিধান করা

৫০২। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) একদা দেখিতে পাইলেন, মসজিদের নিকটে রেশমী কাপড়ের পোষাক বিক্রী হইতেছে। তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে অনুরোধ করিলেন, আপনি উহার এক জোড়া কাপড় ক্রয় করুন; জুমার দিন এবং বিদেশী প্রতিনিধিবর্গের সাক্ষাৎদান করিবার সময় উহা ব্যবহার করিবেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন—রেশমী কাপড় একমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যবহার করিবে, যে আখেরাতে সুখ-শান্তির আশা রাখে না।

---

* প্রায় সকল ইমামগণই এস্থলে "ওয়াজেব" শব্দের অর্থ প্রয়োজনীয় উত্তম কাজ বলিয়াছেন।

ঘটনাক্রমে কিছু দিন পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে রেশমী কাপড়ের কিছু পোষাক উপস্থিত হইল, রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা সর্বসাধারণকে বিতরণ করিলেন, তন্মধ্যে এক জোড়া ওমর (রাঃ)কে দিলেন। ওমর (রাঃ) ঐ কাপড় পাইয়া দুঃখিত মনে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন— ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি আমাকে আজ এই কাপড় দান করিয়াছেন, অথচ রেশমী কাপড়ের বিষয় আপনি যাহা বলিবার বলিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেন, এই কাপড় স্বয়ং তোমাকে ব্যবহার করিবার জন্য দেই নাই। সেমতে ওমর (রাঃ) ঐ কাপড় জোড়া তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতাকে দিয়া দিলেন, সে কাফের ছিল এবং মক্কায় থাকিত।

জুমার দিন ফজরের নামাযে কোন্ ছুরা পড়া উচিৎ

৫০৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিন ফজরের নামাযে ছুরা "আলীফ-লাম-মীম তানজীল" (الم تنزيل) এবং ছুরা হাল-আ'তা আলাল-ইনসানে (هل اتى على الانسان) পড়িতেন।

গ্রাম ও শহর উভয়ের মধ্যেই জুমা জায়েয

● ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে জুমা আরম্ভের পর অন্য মসজিদে জুমা পড়ার মধ্যে সর্বপ্রথম 'জুয়াসা' নামক স্থানে আবদুল কায়েশ গোত্রীয় মসজিদে জুমা হইয়াছিল। 'জুয়াসা' এলাকাটি বাহ্‌রাইন দেশভুক্ত একটি এলাকা।

● আয়লা এলাকার শাসনকর্তা 'রোযায়েক' তথাকার কেন্দ্রীয় শহর হইতে দূরে তাঁহার খামারে একদল শ্রমিক দিয়া কাজ করাইতেছিলেন। তথা হইতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী মোহাম্মেছ ইবনে শেহাব জুহরী (রঃ)কে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, খামার এলাকায় শ্রমিকদেরকে নিয়া জুমার নামায পড়িব কি? ইবনে শেহাব জুহরী (রঃ) লিখিয়াছিলেন, আপনি তথায় অবশ্যই জুমার নামায পড়িবেন।

জুমার নামাযে আদিষ্ট না হইলে সে গোসলের আদিষ্ট হইবে কি?

মহিলাগণ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকগণ—তাহাদের প্রতি জুমার নামাযের আদেশ নাই; জুমার দিনের গোসলের আদেশ তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে কি?

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, জুমার দিনের গোসলের কর্তব্য শুধু তাহাদের উপরই যাহাদের উপর জুমার নামায ফরজ।

৫০৪। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য প্রতি সাত দিনে এক দিন (জুমার দিন) গোসল করা। (বন্ধনীর মধ্যবর্তী কথাটিও হাদীছেরই অংশ। ফতহুলবারী,২—৩০৬)

এই হাদীছ মর্মে মহিলা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও জুমার দিন গোসল করা কর্তব্য।

জুমার জমাতে উপস্থিতি অসাধ্য হইলে জুমা মাফ

৫০৫। **হাদীছ :—** একদা জুমার দিন ভীষণ বৃষ্টি ও কাদার সৃষ্টি হইল। ইবনে আববাস (রাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে নিয়া জুমার নামায পড়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং মোয়াজ্জেনকে হাইয়্যা-আলাস্‌সালাহ বলার সময়ে الصلوة فى الرحال "নিজ নিজ ঘরে নামায পড়িয়া নেও" বলিবার আদেশ করিলেন। ইহাতে লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ইবনে আববাস (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমার এই ব্যবস্থায় চাঞ্চল্য দেখাইতেছ! নবী (দঃ) এইরূপ করিয়াছেন। জুমার নামায অবশ্য ফরজ বটে, কিন্তু এই বৃষ্টি ও কাদার অবস্থায় তোমাদিগকে গোনাহের ভাগী করিব যাহাতে তোমরা হাটু পর্য্যন্ত কাদা জড়াইয়া এই বৃষ্টির মধ্যে মসজিদে আসিবে—ইহা আমি ভাল মনে করি নাই।

ব্যাখ্যা :—"হাইয়্যা আলাস্‌সালাহ" অর্থ নামাযের জন্য আস—এই আহ্বান ও আদেশ বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার—যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে উপস্থিত মুরব্বির পক্ষ হইতে মোয়াজ্জেনের মুখে উচ্চারিত হয়। উহা লঙ্ঘন করা মামুলী কথা নহে; আজানের ঐ বাক্যে মোসলমানদের জমাতে উপস্থিতি কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়, অথচ এইরূপ অবস্থায় জুমার নামাযের জন্য আসার ফরজ মাফ হইয়া গিয়াছে, তাই বাড়ীতে নামায পড়ার কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। জুমা মাফ হইলে বাড়ীতে নিয়মিত জোহর নামায পড়িতে হয়।

কতদূর ব্যবধান হইতে জুমায় উপস্থিত হওয়া উচিৎ

আ'তা (রঃ) নামক বিশিষ্ট তাবেয়ী বলিয়াছেন—যখন তুমি এমন কোন বস্তিতে উপস্থিত থাক, যেই বস্তিতে জুমা হইয়া থাকে এবং যেখানে জুমার আজান দেওয়া হয় তখন জুমার নামাযে শরীক হওয়া তোমার উপর অবশ্য কর্তব্য। আজানের আওয়াজ শুনিতে পাও অথবা না পাও।

বহুরা শহর হইতে ছয় মাইল দূরে "যাবিয়া" নামক খুব নগণ্য বসতির স্থানে আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর একটি নিরালা-নিবাস ছিল; তথায় অবস্থান কালে তিনি কোন দিন ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া বহুরা শহরে জুমার নামায পড়িতেন এবং কোন কোন দিন আসিতেন না।

৫০৬। **হাদীছ :—**আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানগণ মদীনা হইতে দূর-প্রান্তে অবস্থিত নিজ নিজ বাড়ী হইতে এবং মদীনার উর্দ্ধ প্রান্ত হইতে জুমার নামাযের জন্য রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহারা ধূলা-বালী মাখা অবস্থায় আসিতেন, তদুপরি তাঁহাদের শরীরে ঘর্মও নির্গত হইত। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার নিকট ছিলেন তখন ঐরূপ একজন লোক তাঁহার নিকট আসিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন—জুমার দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিলে ভাল হয়।

জুমার নামাযের ওয়াক্ত

৫০৭। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর জুমার নামায পড়িতেন।

৫০৮। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা জুমার নামায যথাসম্ভব শীঘ্র পড়িতাম এবং দ্বিপ্রহরের শয়নও জুমার নামাযের পরই হইত।

অর্থাৎ জুমার নামাযের জন্য বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা হইত ; জুমার নামায না পড়িয়া কোন প্রকার আরামও করা হইত না। অবশ্য জুমার ওয়াক্ত হওয়ার পর তথা সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর যথাসম্ভব শীঘ্রই জুমার নামায পড়িয়া লওয়া হইত।

৫০৯। **হাদীছ ঃ**—ছালামাতুবনুল আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জুমা এমন সময় পড়িতাম যে, নামায শেষ করার পরেও দেওয়ালের ছায়া এতটুকুও হইত না যাহাতে রৌদ্র হইতে আশ্রয় নেওয়া যায়। (৫৯৯ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—জুমা অপেক্ষাকৃত প্রথম ওয়াক্তে যথাশীঘ্র পড়া হইত ; ইহাই এই বর্ণনার মর্ম।

৫১০। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঠাণ্ডার দিনে জুমার নামায অগ্রভাগে পড়িতেন এবং উত্তাপের দিনে বিলম্বে পড়িতেন।

জুমার জন্য ধাবিত হওয়ার আদেশ এবং পদব্রজে উপস্থিত হওয়া

৫১১। **হাদীছ ঃ**—আবাআ ইবনে রেফাআ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জুমার নামাযের জন্য হাঁটিয়া যাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় আবু আবস্ (রাঃ) ছাহাবী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যাহার পা আল্লার রাস্তায় ধূলা মাখিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের জন্য হারাম করিয়া দিবেন। অর্থাৎ দোযখের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

জুমার দিন মসজিদে কাহাকেও উঠাইয়া তাহার স্থানে বসিবে না

কাহাকেও তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে বসা কোন সময়ই বাঞ্ছনীয় নহে ; বিশেষতঃ জুমার দিন।

৫১২। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন—কেহ যেন অন্য মোসলমান ভাইকে তাহার স্থান হইতে উঠাইয়া দিয়া নিজে ঐ স্থানে না বসে, তাহা জুমার দিন হউক বা অন্য কোন দিন এবং মসজিদে হউক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে।

জুমার আজান

৫১৩। **হাদীছ ঃ**—সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর সময়ে জুমার নামাযের জন্য শুধুমাত্র

এক আজান দেওয়া হইত যাহা খোৎবার পূর্বে ইমাম মিম্বরে বসিলে দেওয়া হয়। খলীফা ওসমান (রাঃ)-এর সময়ে যখন মোসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া গেল (এবং মদীনার চতুষ্পার্শে বস্তি অনেক দুর পর্য্যন্ত বাড়িয়া গেল) তখন ওসমান (রাঃ) "যাওরা" নামক একটি উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া ঐ খোৎবার আজানের পূর্বে আর এক আজান দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— প্রত্যেক নামাযের যে আজান দেওয়া হয় তাহা উক্ত নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার জন্য, তাই সেই আজান জমাত আরম্ভের অনেক পূর্বে হয় এবং হইত। আর জুমার নামাযের আজান যাহা খোৎবা আরম্ভে দেওয়া হইত তাহা অবশ্যই নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিত জ্ঞাত করার জন্য ছিল না, নতুবা উহাও জমাত আরম্ভের অনেক পূর্বেই হইত। ঐ আজান জমাত-আরম্ভ জ্ঞাত করার জন্য ছিল, তাই উহা খোৎবার আরম্ভে দেওয়া হইত। কারণ, জুমার খুৎবা উহার নামাযের বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত। প্রথম দিকে মোসলমান কম সংখ্যায় ছিলেন এবং তাঁহারা জুমার দিন বিশেষভাবে অনেক পূর্ব হইতেই নামাযের প্রস্তুতিতে তৎপর হইতেন, তাই ঐ নামাযের ওয়াক্ত জ্ঞাত করার জন্য আজানের প্রয়োজন তখন ছিল না। যখন মোসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়া মদীনা শহরের দুর এলাকা পর্য্যন্ত মোসলমানদের বসতি স্থাপিত হইল তখন জুমার জন্যও নামাযের ওয়াক্ত জ্ঞাত করার আজান দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল এবং খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সমস্ত ছাহাবীদের বর্তমানে অন্য নামাযের ন্যায় জুমার নামাযেরও ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করার আজান খোৎবা আরম্ভের অনেক পূর্বে দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হইল (ফতহুল-বারী, ২—৩১৫)।

উক্ত আজানের নিয়ম প্রবর্তিত হইলে খলীফা ওসমানের আমল হইতেই জুমার নামাযের মূল আজান (যাহা নবী (দঃ)-এর সময়ে খোৎবা-আরম্ভে দেওয়ার প্রচলন ছিল—সেই আজান) ইমাম মিম্বরে বসাবস্থায় ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয় বলিয়া ফতহুল-বারী কেতাবে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

ان عثمان احدث لاعلام الناس بدخول وقت الصلوة قياسا على بقية الصلوات فالحق الجمعة بها وابقى خصوصيتها بالاذان بين يدى الخطيب - (٢—٣١٥)

খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক এই রীতির প্রবর্তন সমস্ত ছাহাবীগণের বর্তমানেই ছিল। খলীফা ওসমানের রীতি অনুসারেই জুমার একটি আজান বর্দ্ধিত করণ গৃহীত হইয়াছে—যে আজান নবীজীর আমলে ছিল না। তদ্রূপ খোৎবার আজান ইমামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেওয়ার রীতিও গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ উভয় রীতিই এক সঙ্গে জড়িত ভাবে সমস্ত ছাহাবীগণের বর্তমানে খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত।

কিন্তু স্মরণ রাখিবে, ইমামের সম্মুখে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, মিম্বর ঘেষিয়া আজান দিবে। সাধারণ মুসল্লিদের প্রথম কাতারে ইমামের সম্মুখ বরাবর দাঁড়াইয়া আজান দিবে—যেই অবস্থাকে সাধারণতঃ ইমামের সম্মুখ বলা যায়।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাহও লিখিয়াছেন যে, খোৎবা আরম্ভের আজানের সময় ইমাম মিম্বরে বসা থাকিবেন। অর্থাৎ আজান আরম্ভের পূর্বেই ইমাম মিম্বরে উঠিয়া বসিবেন এবং খোৎবা আরম্ভ লগ্নে আজান দেওয়া হইবে।

ইমাম মিম্বরের উপর বসিয়া আজানের উত্তর দিবেন

৫১৪। **হাদীছ ঃ**—আবু উমামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি শুনিয়াছি, ছাহাবী মোয়াবিয়া (রাঃ) মিম্বরের উপর বসিয়া মোয়াজ্জেনের আজানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আজানের শব্দসমূহকে উচ্চারণ করিলেন এবং আজান শেষে বলিলেন—হে লোক সকল! আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ বসা অবস্থায় মোয়াজ্জেনের আজান শ্রবণে এইরূপই বলিতে শুনিয়াছি।

মিম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিবে

৫১৫। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মসজিদের মধ্যে একটি খেজুর গাছের থাম ছিল যাহার সংলগ্ন দাঁড়াইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খোৎবা দিয়া থাকিতেন। যখন তাঁহার জন্য মিম্বর তৈয়ার করা হইল এবং তিনি ঐ খেজুর গাছের থাম ছাড়িয়া দিয়া মিম্বরের উপর খোৎবা দান আরম্ভ করিলেন, তখন আমরা নিজ কানে ঐ থামের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, যেরূপ সদ্য প্রসবিতা উট স্বীয় বাচ্চার জন্য কাঁদিয়া থাকে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মিম্বর হইতে নামিয়া আসিয়া উহার উপর হাত বুলাইলে সে শান্ত হইল।

৫১৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দাঁড়াইয়া খোৎবা দিয়া থাকিতেন এবং মধ্যস্থলে একবার বসিয়া পুনরায় দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় খোৎবা প্রদান করিতেন; যেরূপ বর্তমানেও হইয়া থাকে।

খোৎবা বা ভাষণ আল্লার প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ করিবে

৫১৭। **হাদীছ ঃ**—আম্‌র ইবনে তাগলেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কোথাও হইতে কিছু ধন-দৌলত বা অন্য কোন বস্তু আমদানী হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা বিতরণ করিয়া দিলেন। (প্রত্যেককে দেওয়ার পরিমাণ মাল ছিল না, তাই সকলকে না দিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে দিলেন।) তারপর হযরত (দঃ) শুনিতে পাইলেন যে, যাহারা উহার অংশ পায় নাই তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

তখন তিনি ভাষণ দান করিলেন—প্রথমে আল্লার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন, তারপর বলিলেন, আমি অনেক সময় একজনকে দান করি অন্য আর একজনকে দান করি না, অথচ যাহাকে দান করি না সে-ই আমার নিকট বিশেষ সন্তুষ্টিভাজন। এরূপ করার একমাত্র কারণ এই যে, একদল লোক এমন আছে যাহাদের মন এখনও ইসলামের প্রতি কাঁচা—তাহারা চঞ্চল; এখনও তাহাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি স্থিরতা আসে নাই, তাই তাহাদিগকে দান করিয়া থাকি। আর একদল লোক এমনও আছে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা দৃঢ় মনোবল দান করিয়াছেন এবং তাহাদের মনে-প্রাণে ঈমান সুদৃঢ়রূপে পাকা-পোক্তা হইয়াছে; সেই ভরসায় আমি তাহাদিগকে দান করি না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্য হইতেই একজন আম্‌র ইবনে তাগলেব।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আম্‌র ইবনে তাগলেব শপথ করিয়া বলেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শেষ কথাটি আমার নিকট দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন-দৌলত হইতেও অধিক সন্তুষ্টির বস্তু ছিল। (কারণ, আম্‌র ইবনে তাগলেব (রাঃ) দৃঢ় ঈমানদার ও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সন্তুষ্টিভাজন হওয়ার উপর এই কথাটি সনদ ও সাক্ষ্য স্বরূপ ছিল।)

দুই খোৎবার মধ্যে বসিতে হইবে

৫১৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিন দুইটি খোৎবা দিতেন এবং খোৎবাদ্বয়ের মধ্যভাগে বসিতেন।

মনোযোগের সহিত খোৎবা শুনিবে

৫১৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—জুমার দিন একদল ফেরেশতা মসজিদের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া ধারাবাহিকরূপে আগন্তুক মুছল্লিগণের নাম লিখিতে থাকেন। যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে আসিল সে যেন একটি উট ছদকা করিল। তারপরের সময়ের আগন্তুক যেন একটি গরু তারপর যেন একটি দুম্বা, তারপর যেন একটি মোরগ, তারপর যেন একটি আণ্ডা ছদকা করিল। তারপর যখন ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হন তখন ফেরেশতাগণ সব কিছু গুছাইয়া খোৎবার মধ্যে আল্লার জেক্‌র শুনিবার জন্য চলিয়া যান।

ব্যাখ্যা ঃ— জুমার ওয়াক্তের সর্বপ্রথম অংশ অর্থাৎ সূর্য্য আকাশের মধ্যস্থল অতিক্রম করার পর হইতে ইমামের খোৎবার জন্য অগ্রসর হওয়া পর্য্যন্ত সময়টুকুকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং সে অনুপাতে উল্লিখিত পর্য্যায়ে শ্রেণী স্থির করা হয়।

খোৎবার সময় আগত ব্যক্তির দুই রাকাত নামায পড়া

৫২০। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি জুমার দিন এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হইল যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খোৎবা দিতেছিলেন।

তিনি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি নামায পড়িয়াছ? সে আরজ করিল, না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নামায পড়িতে আদেশ করিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—একমাত্র এই একটি ঘটনাই পাওয়া যায় যে, খোৎবা দানকালীন ঐ এক ব্যক্তিকে দুই রাকাত নামায পড়ার আদেশ করা হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় বা খোলাফায়ে-রাশেদীনগণের যমানায় এইরূপের ঘটনা দ্বিতীয় আর দেখা যায় নাই। অথচ খোৎবা প্রদানকালীন কাহারও উপস্থিত হওয়া একটি মামুলী ও অতি স্বাভাবিক বিষয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিতও হইয়াছে, কিন্তু আর কখনও ঐরূপে নামায পড়ার আদেশ করা হয় নাই। এতদ্দৃষ্টে অধিকাংশ ইমামগণের মত এই যে, এই ঘটনাটি কোনও বিশেষ কারণমূলক ছিল। বস্তুতঃ মছআলাহ এই যে—খোৎবা দানকালে নামায পড়া নিষিদ্ধ।

খোৎবার সময় হাত উঠানো

অনেক বক্তা বক্তৃতার সময় উগ্রমূর্তি বা ক্ষিপ্ততা প্রকাশার্থে মুহুঃ মুহুঃ হস্ত উত্তোলন করিয়া থাকে। মোসলেম শরীফে এক হাদীছে এই অভ্যাসের প্রতি নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। বোখারী (রঃ) অত্র পরিচ্ছেদে একটি হাদীছ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এমন কোন বিষয়ের উপর যদি ভাষণদাতা হাত উঠায় যাহা শরীয়তে অনুমোদিত তবে তাহা নিন্দণীয় নহে। জুমার খোৎবায়ও এই মছআলাহ প্রযোজ্য। যেমন—খোৎবার সময় উপস্থিত কোন বিশেষ দোয়া করা ক্ষেত্রে যদি খোৎবার মধ্যে হাত উঠানো হয় তবে তাহা নিন্দণীয় হইবে না। এ সম্পর্কীয় হাদীছখানার অনুবাদ পরবর্তী পরিচ্ছেদে আসিতেছে।

খোৎবার মধ্যে বিশেষ কোন দোয়া করা

৫২১। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় মদীনা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষ পড়িল। ঐ সময় নবী (দঃ) এক জুমার দিন খোৎবারত ছিলেন, এমতাবস্থায় এক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে আসিল এবং হযরতের বরাবরে দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! অনাবৃষ্টির দরুণ (ঘাসের অভাবে) পশুপাল মৃতপ্রায়, (দুধের অভাবে) বাচ্চা-কাচ্চা অনাহারী এবং মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন। আপনি আল্লার নিকট দোয়া করুন, আল্লাহ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করেন। তৎক্ষণাৎ হযরত (দঃ) হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন এবং দোয়া করিলেন—اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا "হে আল্লাহ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন।" উপস্থিত লোকগণও আল্লার রসুলের সঙ্গে হাত উঠাইল এবং দোয়া করিল। ঐ সময় আকাশে মেঘের চিহ্নও ছিল না, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) এখনও হাত নামান নাই, ইতিমধ্যেই পর্বতাকৃতির মেঘমালা মদীনা এলাকার প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। হযরত (দঃ) মিম্বর হইতে নীচে আসিবার পূর্বেই এমন

বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল যে, মসজিদের খেজুর পাতার ছাদ হইতে পানি পড়িয়া হযরতের দাড়ি মোবারকের উপর পানি বহিতে লাগিল। বৃষ্টির দরুন আমাদের বাড়ীতে পৌছা কষ্টকর হইয়া পড়িল। পরবর্তী জুমার দিন পর্য্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হইল; সাত দিন সূর্য্য দেখা গেল না। পরবর্তী জুমার দিন খোৎবার সময়েই ঐ ব্যক্তিই কিম্বা অন্য ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল এবং তাহার সঙ্গে সকলেই চিৎকার করিয়া উঠিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! (অধিক বৃষ্টিপাতে) বাড়ী-ঘর ধ্বসিয়া যাইতেছে, পশুপাল পানিতে ডুবিয়া যাইতেছে, রাস্তা ঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চলাচলের অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেন। হযরত (দঃ) স্মিত হাসিলেন এবং উভয় হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى رُءُوْسِ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ -

"হে আল্লাহ! আমাদের হইতে দূরের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বৃষ্টি বর্ষিত হউক, আমাদের উপরে নয়; বড় বড় পাহার-পর্বতের উপর, ছোট ছোট পাহাড়ে এবং পার্বত্য ও সমতল ভূমিতে এবং বাগ-বাগিচা ও খেত-খামারে বর্ষিত হউক। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতের ইশারার সাথে সাথে মেঘ-খণ্ডগুলি মদীনার আকাশ হইতে পার্শ্ববর্তী দিকে চলিয়া গেল এবং দূরবর্তী এলাকায় বর্ষিল। মদীনার আকাশে মেঘের চিহ্নও থাকিল না এবং এক ফোটা বৃষ্টিও আর রহিল না। নামাযান্তে আমরা রৌদ্রের মধ্যে বাড়ী ফিরিলাম। দূরবর্তী এলাকার বৃষ্টিপাতে "কানাত" নামক গিরি-প্রণালী এক মাস পর্যান্ত প্রবাহমান থাকিল। দূরবর্তী এলাকার প্রত্যেক আগন্তুকই বৃষ্টিপাতের সংবাদ দিতেছিল।

(১২৭, ১৩৭, ১৪৩ পৃঃ)

খোৎবা দানকালীন সকলকে চুপ থাকিতে হইবে

সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন ইমাম খোৎবা প্রদান করে তখন সকলের চুপ থাকা উচিৎ।

৫২২। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে. হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—জুমার দিন খোৎবা দানকালীন তুমি যদি কাহাকেও (মুখে শব্দ করিয়া) বল "চুপ কর" তবে তুমিও নিয়ম লঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত হইবে (এবং এই কারণে তোমারও জুমার ছওয়াব কম হইয়া যাইবে)।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লিখিত বিষয়টি বড়ই যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় —প্রথমে যে ব্যক্তি বলে তাহাকে বাধাদানের জন্য অধিক হট্টগোলের সৃষ্টি করা হয়; ইহা বোকামী ছাড়া আর কি হইতে পারে।

জুমার দিনের একটি মূল্যবান সময় আছে

৫২৩। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জুমার দিনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—এই দিনের মধ্যে এমন একটি মূল্যবান সময় আছে যে, সেই সময়টুকুর মধ্যে নামাযরত অবস্থায় যে কোন দোয়া করা হউক আল্লাহ তায়ালা উহা কবুল করিয়া থাকেন। অবশ্য ঐ সময়টুকু খুবই অল্প—অধিক প্রশস্ত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ সময়টুকু জুমার দিনেই অনির্দিষ্টরূপে রহিয়াছে, যেমন লায়লাতুল-কদর রমজান মাসে অনির্দিষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে ঐ সময়টুকুর অভিলাষী তাহাকে পূর্ণ দিনটিই তৎপরতার সহিত কাটাইতে হইবে। অবশ্য ইমাম খোৎবার জন্য অগ্রসর হওয়াকাল হইতে সূর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যে ঐ মূল্যবান সময়টি পাইবার সম্ভাবনা অধিক।

জুমার নামাযের পূর্বে ও পরে সুন্নত পড়া+

৫২৪। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের পূর্বে দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরেবের পরে স্বীয় গৃহে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত নামায পড়িতেন এবং জুমার নামাযের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

মছআলাহ ঃ—জুমার ফরজের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত এক সালামে পড়া ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ, যেরূপ জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত। (দোররুল মোখঃ)

জুমার নামায হইতে অবসর হইয়া আমোদ-আনন্দে বিচরণ

জুমার দিন জুমার নামাযের প্রতি তৎপরতায় অন্য তৎপরতা ও লিপ্ততা যথাসাধ্য কম করিতে হয়। অবশ্য জুমার নামায হইতে অবসর হইয়া অনুমোদিত লিপ্ততার অনুমতি রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

"যখন নামায সমাপ্ত হইয়া যায় তখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে পার।" নিম্নে এই শ্রেণীরই একটি হাদীছ উল্লেখ হইতেছে।

৫২৫। **হাদীছ ঃ**—ছাহাবী সাহ্‌ল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন, তাঁহার ক্ষেতের মধ্যে পানি প্রবাহিত হইবার নালীসমূহের কিনারায় তিনি "চুকান্দার" নামক সব্জী বপন করিতেন। জুমার দিন তিনি ঐ চুকান্দরের মূলগুলি উঠাইয়া আনিতেন এবং উহার সঙ্গে আটা মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার খাদ্যবস্তু তৈয়ার করিতেন। আমরা জুমার নামাযান্তে তাঁহার বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম করিতাম, তিনি আমাদিগকে উহা খাইতে দিতেন। আমরা আনন্দের সহিত উহা চাটিয়া চাটিয়া খাইতাম। আমরা তাঁহার ঐ খাদ্যের আগ্রহে জুমার দিনের প্রতীক্ষায় থাকিতাম।

+ জুমার নামাযের পূর্বে সুন্নত পড়া বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিলেন, দলীল উল্লেখ করেন নাই। ফতহুল-মোলহেম দ্বিতীয় খণ্ড ৩৯৯ পৃষ্ঠায় ইহার দলীল বর্ণিত আছে।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● জুমার দিন বিশেষভাবে মেছওয়াক করিবে। (১১২ পৃঃ ৫০০)

● মসজিদে এক জোটের দুইজন একত্রে বসা থাকিলে তাহাদের মধ্যে তৃতীয় পর ব্যক্তির বসা উচিৎ নহে। (১২৪ পৃঃ ৫০২ হাদীছ)

● খুৎবা দানকালে মুছল্লীদের লক্ষ্য ও ধ্যান ইমামের (খুৎবার) প্রতি হওয়া চাই। (১২৫ পৃঃ)

● জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনজনের জমাত শর্ত; ইমামের সঙ্গে তিনজন পুরুষ মোক্তাদী হইলে জুমার নামায হইবে অন্যথায় জুমার নামায হইবে না, সে ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া জোহরের নামায পড়িতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে জুমার নামায আরম্ভ করার পর পেছন হইতে মোক্তাদীগণ নামায ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—যদি তিনজন পুরুষ বাকি থাকিয়া থাকে তবে ইমামসহ সকলেরই জুমা শুদ্ধ হইয়া যাইবে (১২৮ পৃঃ)।

আর যদি তিনজনও বাকি না থাকে এবং তাহারা প্রথম রাকাতের সেজদার পূর্বেই চলিয়া যায় তবে ইমামের জুমাও ফাছেদ হইয়া যাইবে, পুনঃ নিয়্যত বাঁধিয়া জোহর পড়িতে হইবে। আর যদি সেজদার পরে যায় তবে ইমাম জুমারূপেই স্বীয় নামায পুরা করিবে। (শামী, ২-৭৬১)

শত্রুর অক্রমণ সম্ভাবনাবস্থায় জমাতে নামায পড়ার নিয়ম

জমাত ব্যতিরেকে একাকী ছিন্ন-বিচ্ছিন্নরূপে নামায পড়াকে শরীয়ত মোটেই পছন্দ করে না, একস্থানে উপস্থিত সমস্ত মোসলমান এক জমাতে নামায পড়া আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন শত্রুর মোকাবেলায় একতা ও শৃঙ্খলা শত্রুপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু এদিকে সকলে একত্রে নামাযরত হইলে শত্রুপক্ষের সুযোগ পাওয়ার আশঙ্কা ও ভয় আছে, তাই শরীয়ত এমন ক্ষেত্রে জমাত কায়েমের বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেও সুদীর্ঘ বয়ান বিদ্যমান রহিয়াছে। (৫ পাঃ ১২ রুঃ দ্রষ্টব্য)

এতদ্দৃষ্টে উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলাম ধর্ম কিরূপ পূর্ণাঙ্গ, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, ব্যাপক ও জীবন্ত ধর্ম—যাহার মধ্যে নিছক ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং গৃহকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেও বিধি-ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং আপদ-বিপদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটির অবস্থায়ও জীবনকে কিরূপে দ্বীন ও ধর্মের ভিতর দিয়া পরিচালিত করা যায় তাহার সহজ পথও প্রদর্শন করা হইয়াছে।

৫২৬। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নজদ এলাকার কোনও জেহাদে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা শত্রুপক্ষের নিকটবর্তী অবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হইল, রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হইলেন এবং আমরা দুই দলে বিভক্ত হইলাম। এক দল শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখার কাজে নিযুক্ত রহিল, আর একদল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায আরম্ভ করিল। এইরূপে এক রাকাত নামায হইলে পর নামাযরত দল শত্রুর প্রতি চলিয়া গেল এবং শত্রুর প্রতি নিযুক্ত দল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে দ্বিতীয় রাকাতে

শরীক হইল। যেহেতু (হুজুর হিসাবে বা বস্তুতঃই দুই রাকাতওয়ালা নামায ছিল, তাই) দ্বিতীয় দলকে লইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) দ্বিতীয় রাকাত পড়ার পর রসুলুল্লার (দঃ) নামায পূর্ণ হইয়া গেল; তিনি সালাম ফিরিলেন। কিন্তু মোক্তাদীগণের প্রত্যেক দলেরই এক এক রাকাত নামায হইল এবং এক এক রাকাত বাকী রহিল; ঐ এক রাকাতকে (প্রথম দল লাহেকের ন্যায়, দ্বিতীয় দল মসবুকের ন্যায়) তাহারা নিজে নিজে পড়িল।

৫২৭। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শত্রু দল যদি এত অধিক হয় যে, তাহাদের মোকাবিলায় মোসলমান সৈন্যদল বিভক্ত করিলে আত্মরক্ষায় যথেষ্ট হইবে না, তবে প্রত্যেকে মাটিতে দাঁড়ানো বা বাহনে আরোহিত নিজ নিজ অবস্থায়ই একা একা নামায আদায় করিবে। (এমনকি কেবলামুখী হওয়া সম্ভব না হইলে যেই দিকে সম্ভব সেই দিকেই এবং রুকু সেজদা সম্ভব না হইলে শুধু মাথার ইশারায় রুকু সেজদার কাজ করিয়া নামায আদায় করিবে।

(ফতহুল-বারী, ২—৩৪৬)

৫২৮। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কোনও এক জেহাদের ঘটনায় আমরা নামায পড়িলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইমাম হইলেন, আমরা সকলেই একত্রে তাঁহার পেছনে এক্তেদা করিয়া নামাযে দাঁড়াইলাম। যখন তিনি রুকুতে গেলেন তখন প্রথম কাতারের লোকগণ তাঁহার সঙ্গে রুকু করিল, সেজদার সময় সেজদা করিল, কিন্তু পেছনের কাতারের লোকগণ সেই রুকু-সেজদা না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং প্রথম কাতারের লোকগণ সেজদা হইতে উঠিবার পর পেছনের কাতারের লোকগণ রুকু-সেজদা করিল। (এইরূপে সকলেরই এক রাকাত হইল,) দ্বিতীয় রাকাতের সময় (প্রথম কাতারের লোকগণ পেছনে এবং) পেছনের কাতারের লোকগণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পূর্বের ন্যায়ই দ্বিতীয় রাকাত পড়া হইল। (এইরূপে সকলেরই সমরূপে দুই রাকাত পুরা হইলে পর একত্রে সালাম করিল।) সকলেই এক জমাতে শরীক ছিল, কিন্তু একে অন্যকে পাহারাও দিতেছিল।

ব্যাখ্যা :—শত্রুর ভয় ও আশঙ্কাবস্থায় নামায এক জমাতে পড়ার বিভিন্ন নিয়ম বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিভিন্নতা এই জন্য যে, শত্রুপক্ষের অবস্থান বিভিন্ন রূপের ছিল এবং শত্রুপক্ষের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই জমাতের নিয়ম ধার্য্য করা হইত। যেমন ৫২৬নং হাদীছের ঘটনায় শত্রুপক্ষ মোসলমানদের সম্মুখদিকে তথা কেবলার দিকে ছিল না, বরং অন্যদিকে ছিল, তাহাদের মোকাবিলায় দাঁড়াইয়া থাকার জন্য যে দল নিযুক্ত হইল তাহারা ঐ অবস্থায় নামায আরম্ভ করিতে পারিল না, কারণ তাহারা কেবলা দিকে নয়। ৫২৮নং হাদীছের ঘটনায় শত্রুপক্ষ কেবলা দিকে ছিল, তাই সকলে একত্রেই নামায আরম্ভ করিল। রুকু সেজদার সময় আশঙ্কা; তাই পেছনের কাতার পাহারায় রহিল। এইভাবে যখন যেইরূপে জমাত করা সম্ভব হইয়াছে, তখন সেই নিয়মেই জমাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইহা অতি স্পষ্ট যে, এসব নিয়ম নামাযের সাধারণ নিয়ম হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র ও পৃথক, কিন্তু যেহেতু এই স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তনের জন্য ইহার বিস্তারিত বিবরণ দান করতঃ কোরআন শরীফের প্রায় একটি রুকু নাজেল হইয়াছে এবং বহু হাদীছে ইহা বর্ণিত; তাই এই স্বাতন্ত্র্যকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নিয়ম প্রবর্তন করিয়া এক জমাতকে যথাসম্ভব রক্ষা করা হইয়াছে। কারণ, ইহা আল্লার নিকট অতি পছন্দনীয় এবং মোসলেম সমাজের জন্য আবশ্যকীয় বস্তু, তদুপরি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলায় একতা প্রদর্শন বিশেষ ফলদায়ক।

যুদ্ধ চলাকালীন বা বিজয় সংগ্রাম অবস্থায় নামাযের নিয়ম

ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলিয়াছেন, যদি বিজয়ের সূচনা ও সম্ভাবনা সন্নিকটে দেখা যায় এবং এমতাবস্থায় কোন মতেই রুকু-সেজদা করিয়া জমাতে নামায পড়া সম্ভব না হয় তবে প্রত্যেকেই নামায শুধু মাথার দ্বারা ইশারায় পড়িবে, তাহাও না হইলে নামায কাজা করিবে।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফা ওমরের আমলে) আবু মুছা আশয়ারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অধীনে 'সুস্তর' শহরের দুর্গ আক্রমণ করা হইল; আমি সেই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম।

ভোর বেলায় আক্রমণ চলিল, যুদ্ধের এরূপ তীব্রতা ছিল যে, আমরা কোন মতেই ফজরের নামায পড়িতে সক্ষম হইলাম না। অধিক বেলা হইলে আমরা ফজরের নামায পড়িবার সুযোগ পাইলাম এবং অধিনায়ক আবু মুছা (রাঃ) ছাহাবীর সহিত নামায পড়িলাম। শহরটি আমাদের জয় হইল। (জেহাদের সঙ্কটময় অবস্থায় যে নামায পড়িয়াছিলাম যদিও উহা কাজা নামায ছিল তবুও উহাতে এতই অনুরক্তি লাভ করিয়াছিলাম যে,) ঐ নামাযের বিনিময়ে সমগ্র জগতের রাজত্ব ও ধন-সম্পদ আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।

৫২৯। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খন্দকের জেহাদে একদা ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ক্রুধাবস্থায় কাফেরদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! সূর্য্য অস্তমিত প্রায়, কিন্তু অদ্য আছরের নামায পড়িতে পারি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমিও ত এখন পর্য্যন্ত নামায পড়িতে পারি নাই। এই বলিয়া হযরত (দঃ) একটি সমতল ভূমিতে গেলেন এবং অজু করিয়া সূর্য্যাস্তের পরেই আছরের নামায পড়িলেন তারপর ঐ ওয়াক্তের মগরেবের নামায পড়িলেন।

মছআলাহ ঃ—জেহাদের সময় শত্রুকে ধাওয়া করা বা শত্রু কর্তৃক তাড়িত হওয়াকালে যদি নামাযের সঙ্কীর্ণ সময় উপস্থিত হয় তবে আরোহিত অবস্থায় ধাবমান রূপেই মাথার ইশারায় নামায আদায় করিবে (১২৯ পৃঃ)। আর যদি পদব্রজে ছুটিতে থাকে তবে কোন কোন ইমামের মতে সেই দৌড়ের অবস্থায়ই মাথার ইশারার সহিত নামায আদায় করিবে; হানফী মজহাবের মত এই যে, এই অবস্থায় নামায কাজা করিবে।

মছআলাহ ঃ—ভোর বেলা শত্রুর শহর বা দুর্গের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা হইলে সুযোগ প্রাপ্তে ফজরের আউয়াল ওয়াক্তে অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়িয়া নিবে। (১২৯ পৃঃ)

ঈদের দিন আমোদ-প্রমোদ করা

৫৩০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোরবাণী বা রোযার এক ঈদের দিন আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট আমার গৃহে আসিলেন।

وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت انصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين وتدففان وتضربان (১৩০ ও ৫০০)

ঐ সময় আমার নিকটে দুইটি মদীনাবাসী বালিকা সেই সব পদ্য গাহিতে ছিল যেই সব পদ্য মদীনাবাসীরা তাহাদের ইসলাম-পূর্ব ঐতিহাসিক বোয়াছ-যুদ্ধে উভয় পক্ষ নিজ নিজ গর্ব-রচনায় গাঁথিয়া ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, বালিকাদ্বয় কোন গায়িকা ছিল না। বালিকাদ্বয় দফ্ বা ডুগিও বাজাইতেছিল, লাফালাফিও করিতেছিল। নবী (দঃ) তখন বিছানায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) আমাকে এবং বালিকাদ্বয়কে ধমকাইলেন এবং বলিলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে শয়তানের বাঁশি? তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) চাদর হইতে মুখ বাহির করিয়া আবু বকরের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়, তাহাদিগকে ছাড়; প্রত্যেক জাতিরই খুশীর দিন আছে। আজিকার দিন আমাদের খুশীর দিন। অতঃপর হযরত (দঃ) এই দিক হইতে লক্ষ্য ফিরাইয়া নিলে আমি বালিকাদ্বয়কে টিপুনি দিয়া চলিয়া যাইতে বলিলাম; তাহারা চলিয়া গেল।

আরও একটি ঘটনা—একদা ঈদের দিন কতিপয় হাব্শী লোক মসজিদে ঢাল-খঞ্জর চালনার খেলা করিতেছিল। আমি নিজে বলিলাম কিম্বা হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, খঞ্জর-খেলা দেখিতে চাও? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) আমাকে আড়াল করিয়া রাখিতেছিলেন। আমার গণ্ডদেশ হযরতের গণ্ডের সহিত লাগাইয়া আমি হাবশীদের অস্ত্র চালনা দেখিতেছিলাম। ওমর (রাঃ) তাহাদিগকে ধমকাইলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়; আর ঐ খেলোয়াড় হাবশীদেরকে বলিলেন, ভয় নাই—তোমাদের কাজ করিয়া চল।

আমি নিজেই অবসাদ অনুভব করিলে হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, মন ভরিয়াছে কি? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত (দঃ) বলিলেন, তবে চলিয়া যাও।

● ঈদের দিন আমোদ-প্রমোদের দিন; মোসলমানদের আমোদ-প্রমোদ কি আকারের হইবে তাহাই হাদীছের ঘটনাদ্বয়ে দেখান হইয়াছে; একটি কচি-কাঁচাদের, অপরটি বড়দের।

প্রথম ঘটনায় বালিকাদ্বয় সুরের সহিত গর্ব-গাঁথার পদ্য বা কবিতা গাহিতেছিল; আবু বকর (রাঃ) ভাবিলেন, সুরের সহিত যাহাই গাওয়া হইবে তাহাই শয়তানের বাঁশি তথা শরীয়ত-নিষিদ্ধ, তাই তিনি বাধা দিলেন। বস্তুতঃ আরবীতে সুরকেই "গেনা" বলা হয় যাহার অর্থ সুরের সহিত আবৃতি করা; এই জন্যই সুন্দর সুরে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকেও আরবীতে "গেনা" বলা যায়। সুর বিভিন্ন প্রকারের, গানের সুর, তারানার সুর কাব্যের সুর, কোরআন তেলাওয়াতের সুর। এর মধ্যে গানের সুর হইল শয়তানের বাঁশি তথা শরীয়ত নিষিদ্ধ। উক্ত ঘটনায় বালিকাদ্বয়ের সুরে গান ছিল না, বরং যুদ্ধের তারানা বা পদ্য ও কবিতা ছিল যাহার স্পষ্ট উল্লেখ হাদীছে রহিয়াছে। এবং বালিকাদ্বয় সুর-শিল্পীও ছিল না বলিয়া আয়েশা (রাঃ) নিজেই স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, তাই ঈদের আমোদ ক্ষেত্রে বালিকাদ্বয়ের কার্য্যের প্রতি হযরত (দঃ) সমর্থন জানাইয়াছেন। এইত হইল সুর ও গাওয়া সম্পর্কে।

উক্ত ঘটনার দ্বিতীয় জিনিষটি ছিল "دفان" বালিকাদ্বয় দফ্ বাজাইতে ছিল। "দফ্" মাটি, কাঠ ইত্যাদির খোলের একদিকে চামড়া অপর দিক খোলা—যাহাকে বাংলায় ডুগি বা বাঁয়া বলে; বাঁ হাতে ধরিয়া ডান হাতের আঙ্গুল পিটাইয়া উহা বাজান হয়। আনন্দ উপলক্ষে অন্য কোন বাদ্যের সঙ্গে মিলাইয়া নয়; শুধু দফ্ বা ডুগি বাজান শরীয়তে জায়েয রহিয়াছে।

চলতি যুগের এলমহীন জ্ঞানবাগীশরা বলিতে চান, রসুলুল্লার যুগ ও দেশ তথা অনুন্নত যুগ ও দেশে এই এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রই ছিল, তাই এই শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র শরীয়তের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ বর্তমান আবিষ্কারের যুগের বাদ্যযন্ত্রসমূহ রসুলের যুগে থাকিলে এইগুলিও তাঁহার অনুমোদন লাভ করিত—ইহা হইল জ্ঞানবাগীশদের কেয়াছ। এই শ্রেণীর লোকদের জানা উচিৎ--ঢোল, সারিন্দা, বেহালা, দোতারা, ছেতারা এবং নানা রকমের বাঁশি তখনও প্রচলিত ছিল। নতুবা তৎকালীন আরবী অভিধানে এই সব নাম বিদ্যমান থাকিত না। হাদীছেও বিভিন্ন নামের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ এবং নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী রহিয়াছে। যথা—

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر والكوبة

"রসুলুল্লাহ (দঃ) মদ, জুয়া, এবং ঢোল বা সারিন্দ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।" আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উভয় ছাহাবী হইতে উক্ত বিষয়ের হাদীছ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে।

ঢোল এবং সারিন্দা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র উভয় অর্থেই আরবী ভাষায় "كوبة—কুবা" শব্দ ব্যবহৃত হয় (মেরকাত দ্রষ্টব্য)। আর এক হাদীছে আছে—

قال النبى صلى الله عليه وسلم اعرنى ربى عزوجل بمحق المعازف والمزامير

"নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে আদেশ করিয়াছেন—সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের এবং সকল প্রকার বাঁশীর উচ্ছেদ করিতে।" (মেশকাত—৩১৮)

উক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা ঢোল, সারিন্দা ও বাঁশী স্পষ্টরূপেই নিষিদ্ধ হইল।

এতদ্ভিন্ন "معازف—মায়া'যেফ" বহু বচন শব্দ দ্বারা সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উচ্ছেদের কথাই বলা হইয়াছে। যেরূপ দ্বিতীয় হাদীছে উল্লেখ আছে। আরও এক হাদীছে কেয়ামতের আলামত রূপে বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখে বলা হইয়াছে—

ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور (মেশকাত—৪৭০)

"গায়িকা এবং বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব হইবে, মদ্য পানের চর্চা হইবে।" ফেকাহশাস্ত্রে ত প্রত্যেক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের নাম উল্লেখ করতঃ নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে।

উক্ত ঘটনায় তৃতীয় একটি কার্য্য ছিল تضربان যাহার অনুবাদ করা হইয়াছে "লাফা-লাফি" করিতেছিল; এই শব্দের মধ্যে নাচ-নৃত্যের অর্থ মোটেই নাই। "নাচ বা নৃত্য" অর্থে আরবী ভাষায় অতি প্রসিদ্ধ বিশেষ শব্দ রহিয়াছে, رقص; এস্থলে ترقصان "তাহারা নাচ ও নৃত্য করিতেছিল" বলা হয় নাই। ضرب শব্দের অর্থ পদক্ষেপণ, অতএব ترقصان না বলিয়া تضربان বলার তাৎপর্য্য ইহাই যে, সেস্থলে নাচ-নৃত্য ছিল না; ছিল শুধু এলোমেলো পদক্ষেপণ তথা বাল্যসুলভ লাফালাফি।

যাহারা গান-বাদ্য, নাচ-নৃত্য করিতে এবং করাইতে অভিলাসী, তাহারা লাগামহীন স্বাধীনতার যুগে তাহা করিবেন, কিন্তু এই সব আবর্জনার মধ্যে হাদীছকে টানিয়া আনিয়া হাদীছকে অপবিত্র করতঃ ঈমান হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন? বিষ খাইতে ইচ্ছা হয় খাইবেন, কিন্তু ডাক্তারের নামে বিষ খাইবেন কেন? ডাক্তারের প্রিসক্রিপ্‌শনে যে, বিষ ছিল না; বরং যাহার দ্বারা বিভ্রান্তি হইয়াছে উহা ছিল শুধু (Colour) রং—তাহা প্রতিপন্ন করতঃ যাহারা মোসলমান থাকিতে চান তাঁহাদের ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় ঘটনায় হাবশীরা অস্ত্র চালনার খেলা করিতেছিল, ওমর (রাঃ) উহাকে শুধু খেলাই গণ্য করিয়া মসজিদে উহার অনুষ্ঠানে বাধা দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত খেলায় জেহাদের প্রশিক্ষণ ছিল, তাই উহা এবাদতও ছিল। মসজিদের মূল উদ্দেশ্য নামাযের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া সব রকম এবাদতই তথায় করা যায়, তাই উহা হযরতের সমর্থন লাভ করিয়াছিল।

ঈদুল-ফিৎরের দিন ঈদগাহে যাইবার পূর্বে কিছু খাওয়া উচিৎ

৫৩১। হাদীছ:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদুল-ফেৎরের দিন অন্ততঃ কয়েকটি খুরমা না খাইয়া সকালে বহির হইতেন না এবং তিনি বে-জোড় সংখ্যায় খুরমা খাইতেন।

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোরবাণীর ঈদের দিনও নামাযের পূর্বে সকাল বেলা খাওয়া জায়েয আছে।

ঈদগাহের ময়দানে মিম্বরের ব্যবস্থা আবশ্যক নহে

৫৩২। হাদীছ ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোরবানী বা রোযার ঈদের দিন ঈদগাহে যাইয়া সর্বপ্রথম নামায পড়াইতেন। নামাযান্তে সব লোক নিজ নিজ স্থানেই বসিয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের প্রতি দণ্ডায়মান হইয়া ওয়াজ-নছীহত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ বয়ান করিতেন। তারপর কোথাও কোন সৈন্যদল প্রেরণের প্রয়োজন হইলে উহার ব্যবস্থা করিতেন বা কোন আদেশ জানাইবার দরকার হইলে জানাইতেন, তারপর বাড়ী চলিয়া যাইতেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর এই ব্যবস্থাই—প্রচলিত থাকে। কোন এক ঈদের দিন আমি মারওয়ানের সঙ্গে ময়দানে গেলাম, মারওয়ান তখন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। আমরা ময়দানে আসিয়া দেখি, কাছীর-ইবনে ছল্‌ৎ নামক এক ব্যক্তি একটি মিম্বর তৈয়ার করিয়া উপস্থিত রাখিয়াছে এবং মারওয়ান নামায পড়িবার পূর্বেই উহার উপর আরোহণের জন্য উদ্যত হইতেছে। আমি তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলাম, যেন সে ক্ষান্ত হয়, কিন্তু সে ক্ষান্ত না হইয়া ঐ মিম্বরের উপর আরোহণ করিল (এবং নামাযের পূর্বেই খোৎবা প্রদান করিল)। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমরা সুন্নত তরীকা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছ। সে উত্তর করিল, হে আবু সায়ীদ! তোমরা যাহা শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছ এখন তাহা চলিবে না। তখন আমি বলিলাম, খোদার কসম—আমরা যাহা শিক্ষা করিয়াছি—তাহাই উত্তম, উহার তুলনায় যাহা আমরা শিক্ষা করি নাই। তারপর মারওয়ান বলিল, জনসাধারণ নামাযের পরে বসিয়া থাকিয়া আমাদের খোৎবা শোনে না, তাই নামাযের পূর্বেই খোৎবা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছি।

মছআলাহ ঃ—ঈদগাহে মিম্বর ব্যবহার জায়েয, তথায় মিম্বর তৈরী করা উত্তম।

ঈদের খোৎবা নামাযের পরে হইবে এবং ঈদের নামাযে আজান বা একামত বলা হইবে না

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন সময়ই কোন ঈদের নামাযের জন্য আজান দেওয়া হইত না।

৫৩৩। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদুল-ফেৎরের দিন ঈদগাহে যাইয়া প্রথমে নামায পড়িয়াছেন—খোৎবার পূর্বেই।

৫৩৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এবং আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ঈদের নামায পড়িয়াছি। তাঁহারা প্রত্যেকেই ঈদের নামায খোৎবার পূর্বে পড়িতেন।

৫৩৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) সকলেই ঈদের নামায খোৎবার পূর্বে পড়িতেন।

৫৩৬। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঈদুল-ফেৎরের দিন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুই রাকাত নামায পড়িলেন। ঐ দুই রাকাতের পূর্বে বা পরে অন্য কোন (সুন্নত, নফল) নামায পড়েন নাই। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে আসিলেন যে স্থানে নারীগণ উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে ছদকা করার আহ্বান জানাইলেন, তখন নারীগণ নিজ নিজ কানের ও নাকের অলঙ্কারাদি ছদকা স্বরূপে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিতে আরম্ভ করিল।

ঈদের দিন অস্ত্র বহন

ঈদের দিন ঈদগাহে বা পথে ঘাটে যেখান অধিক মানুষের সমাগম বা গমনাগমন হইবে এইরূপ স্থানে অস্ত্র-বহন নিষিদ্ধ; যাহাতে আঘাত লাগার ঘটনা না ঘটে। হাছান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, ঈদের দিন অস্ত্র-বহন নিষিদ্ধ, যদি মোসলমানদের উপর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে।

৫৩৭। হাদীছ ঃ— সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজ্জের সময় মিনার মধ্যে আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর সঙ্গে ছিলাম; হঠাৎ এক ব্যক্তির হাতের বর্শার লৌহ-ফলক তাঁহার পায়ে বিদ্ধ হইল। আমি উহা তাঁহার পা হইতে টানিয়া বাহির করিলাম। শাসনকর্তা হাজ্জাজ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন, কে এই কাজ করিল জানিতে পারিলে শাস্তি দিতাম। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনিই আমাকে আঘাত দিয়াছেন। হাজ্জাজ বলিলেন, তাহা কিরূপে? তিনি বলিলেন? এই দিনে অস্ত্র-বহন করা হইত না, আপনি তাহা করিয়াছেন; (আপনাকে দেখিয়া অন্যেও করিয়াছে।) হরম শরীফে অস্ত্র লইয়া প্রবেশ করা হইত না, আপনি তাহাও করিয়াছেন।

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন এবাদত করার ফজিলত

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, واذكروا الله فى ايام معلومات "কতিপয় সুপরিচিত দিনে বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালার জিকর ও এবাদত কর" এই আয়াতে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনই উদ্দেশ্য।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) উক্ত আয়াতের উপর আমল করনার্থে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন সময় সময় বাজারে যাইয়া তকবীর বলিতে থাকিতেন; জনগণও তাঁহার সঙ্গে তকবীর বলিয়া যাইত।

৫৩৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের এবাদত হইতে অধিক ফজিলতওয়ালা অন্য কোন

দিনের কোন এবাদতই হইতে পারে না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন—জেহাদও নয় কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—জেহাদও নয়। অবশ্য কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির জেহাদ যে স্বীয় জান-মাল ও সর্বস্ব লইয়া জেহাদের ময়দানে উপস্থিত হইয়াছে এবং তথা হইতে তাহার কিছুই ফেরত আসে নাই।

ঈদগাহে এক পথে যাওয়া অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করা

৫৩৯। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঈদের দিন এক পথে যাইতেন এবং অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

মছআলাহ ঃ—ঈদের দিন যথাসাধ্য ভাল পোষাক পড়া উত্তম (১০৩ পৃঃ ৫০৩ হাঃ)।

মছআলাহ ঃ—ঈদের নামায শীঘ্র পড়া উত্তম। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্র (রাঃ) এশরাক নামাযের সময়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, এইরূপ সময়ে আমরা (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে) ঈদের নামায হইতে অবসর হইয়া যাইতাম।

মছআলাহ ঃ—জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর-নামায হইতে ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ আছর তথা সূর্য্যাস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত তকবীর বলিতে হয়।

পবিত্র কোরআনে আছে, واذكروا الله فى ايام معدودات "আল্লার জিক্র বিশেষভাবে কর কতিপয় নির্দ্ধারিত দিনে।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত তারিখ-গুলিই এই কতিপয় নির্দ্ধারিত দিনের উদ্দেশ্য।

এই তকবীরের একটি পর্য্যায় হইল ওয়াজেব; উক্ত পাঁচ দিন প্রত্যেক ফরজ নামাযের সংলগ্নে তকবীর বলিবে। অগ্রগণ্য ফতওয়া অনুসারে ইহা জমাতের মুছল্লী, একা মুছল্লী, নারী-পুরুষ; এমনকি মুসাফির—সকলের উপরই ওয়াজেব (শামী, ১—৭৮৭)। আর এক পর্য্যায় হইল মোস্তাহাব; চলায়-ফেরায়, হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, শয়নে, উঠনে, বসনে, সকল নামাযের পরে তকবীর বলা। ● খলীফা ওমর (রাঃ) হজ্জের সময় মিনার মধ্যে উক্ত দিনসমূহ স্বীয় তাবুতে থাকিয়া তকবীর বলিতেন; নিকটবর্তী মসজিদের লোকেরা সেই তকবীরের শব্দ শুনিয়া তকবীর বলিত এবং সেই সঙ্গে বাজারের লোকেরাও তকবীর বলিয়া উঠিত; এইভাবে একত্রে সকলের তকবীরে সারা মিনা এলাকা গুঞ্জিত হইত। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত দিনসমূহে প্রত্যেক নামাযের পর এবং বিছানায় থাকিয়া, তাবুতে বসিয়া, উঠ-বসায়, চলা-ফেরায়—সর্বাবস্থায় পূর্ণদিনগুলিতেই তকবীর বলিতেন। ● উম্মুল-মোমেনীন (রাঃ) তকবীর বলিতেন; অন্যান্য মহিলারাও তকবীর বলিতেন। তকবীর যে কোন আকারে বলিলেই হয় তবে উত্তম এই—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

মছআলাহ ঃ—ঈদের নামাযেও ইমামের সম্মুখে ছোতরার ব্যবস্থা রাখা চাই।

মছআলাহ ঃ—নারীদের এমনকি ঋতু অবস্থার নারীরও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া—এই মছআলার পূর্ণ বিবরণ ২২২ নম্বর হাদীছের ব্যাখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।

মছআলাহ ঃ—বালকদের ঈদেগাহে উপস্থিত হওয়া জায়েয ; প্রমাণে ইমাম বোখারী (রঃ) ৮১ নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। বালকদের ঈদগাহে যাওয়া বরকত লাভের জন্য এবং ইসলামের গৌরব প্রকাশের জন্য ; সুতরাং যে সব বালক নামায পড়ার উপযুক্ত নহে তাহারও যাইতে পারিবে, অবশ্য তাহাদের সঙ্গে এরূপ লোক থাকা বিশেষ প্রয়োজন যে তাহাদিগকে খেলা-ধূলা, হট্টগোল ইত্যাদি হইতে বিরত রাখিবে। (ফতহুলবারী ২—৩৩৭)

মছআলাহ ঃ—ঈদগাহে মিম্বর থাকার প্রয়োজন নাই, আর দুর হইতে ঈদের নামাযের স্থান-পরিচিতিরূপে ঈদগাহে কোন নিশান বা পতাকা উড্ডীন করা জায়েয। (১৩৩ পৃঃ ৮১ হাঃ)

মছআলাহ ঃ— যাহার ঈদের জমাত ছুটিয়া যায় ; কোথাও যাইয়া জমাতে শামিল হওয়ার সুযোগ না থাকে এবং যাহাদের প্রতি ঈদের নামাযের হুকুম নাই, যেমন—মেয়েলোক বা যে এলাকায় শুধু ২।৪ জন মুসলমান আছে ; এইরূপ লোকদের জন্য ঈদের দিন সূর্য্য মধ্যেকাশে আসিবার পূর্বে দুই রাকাত (হানফী মজহাব মতে চার রাকাত শামী ১—৮৭৩) নফল নামায সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তকবীর ব্যতিরেকে পড়িয়া নেওয়া ভাল। মহিলাদের জন্য এই নামায ঈদের জমাত শেষ হইলে পর পড়িতে হইবে (শামী, ১—৭৭৭)। ● সাধারণভাবে ঈদের জমাতের ব্যবস্থা না থাকার এলাকায় কিছু সংখ্যক মুসলমান একত্রিত হইলে তাহারা ঈদের জমাত করিতে পারে। আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর একটি নিরালা-নিবাস ছিল বছরা শহর হইতে ছয় মাইল দুরে "যাবিয়া" নামক স্থানে, সেখানে নগণ্য বসতি ছিল ; ঈদের জমাতের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল না। (আনাছ (রাঃ) ছাহাবীর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ ; ১৬৬ পৃষ্ঠায় একটি হাদীছ দ্রষ্টব্য।) তিনি তাঁহার ছেলেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে নিয়া তথায় ঈদের জমাত করিয়াছেন (১৩৪ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ— ঈদের নামাযের পুর্বে বা পরে নফল নামায পড়িবে না (১৩৫ পৃঃ ৫৬৬ হাঃ)। ঈদের নামাযের পূর্বে ঈদগাহ বা অন্যত্র কোথাও নফল নামায পড়িবে না, আর পরে ঈদগাহে পড়িবে না ; অন্যত্র পড়াতে কোন দোষ নাই (শামী ১—৭৭৮)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বোখারী (রঃ) ঈদের বিবরণে কোরবাণী সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। কোরবাণী সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ অন্যত্র আছে, তথায়ই উহার অনুবাদ হইবে।

বেতের-নামাযের বিবরণ

৫৪০। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, দুই দুই রাকাত করিয়া তাহাজ্জুদ নামায পড়িতে থাকিবে। যখন ছোবহে-ছাদেক নিকটবর্তী হইবে তখন এক রাকাত পড়িয়া লইবে যদ্দারা তাহার নামায বেতের হইয়া যাইবে।

ইবনে ওমরের খাদেম 'নাফে' বর্ণনা করিয়াছেন, ইবনে ওমর (রাঃ) বেতের নামাযের দুই রাকাত এবং ঐ এক রাকাতের মধ্যে সালাম ফিরাইতেন, এমনকি কথাবার্তাও বলিতেন।

ইবনে ওমর শাগের্দ ও বিশিষ্ট তাবেয়ী কাসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যত লোকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি (অর্থাৎ ছাহাবীগণ) তাঁহাদের মধ্যে অনেক লোককে দেখিয়াছি, (এক সঙ্গে) তিন রাকাত বেতের পড়িয়া থাকেন। এবং বেতের নামাযের উভয় নিয়মই শুদ্ধ; আমি আশা করি উহার কোনটিই দূষণীয় নহে।

৫৪১। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের নামায (বেতের সহ) এগার রাকাত পড়িতেন। এক একটি সেজদা এত দীর্ঘ করিতেন যত সময়ে আমরা কোরআন শরীফের পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতে পারি এবং ফজরের সুন্নত দুই রাকাত পড়িতেন, তারপর ডান পার্শ্বে শায়িত থাকিতেন; মোয়াজ্জেন খবর দিলে ফজরের নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

বেতের নামায পড়িবার নিয়ম

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছেন, বেতের নামায নিদ্রার পূর্বেই পড়িবার জন্য।

৫৪২। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী রাত্রির বিভিন্ন অংশে (—প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে) বেতের নামায পড়িয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সর্বশেষ আমল ছিল শেষ রাত্রে বেতের পড়া।

৫৪৩। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, রাত্রির সমস্ত নামাযের শেষে বেতের পড়িবার জন্য।

মছআলাহ ঃ—বেতের নামাযের পর নফল নামায পড়া নাজায়েয নহে, অতএব কেহ এশার নামাযের সহিত বেতের পড়িয়া তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হইলে তাহাজ্জুদ পড়িবে ইহাতে মোটেই কোন দোষ নাই। অবশ্য যাঁহারা তাহাজ্জুদ নামাযে পাকা-পোক্তা অভ্যস্ত তাঁহাদের জন্য উত্তম হইল এশার সহিত বেতের নামায না পড়িয়া তাহাজ্জুদের শেষে বেতের নামায পড়া—উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই (ফতহুল-বারী, ২—৩৮৫)। এতদ্ভিন্ন বেতের নামাযের পর দুই রাকাত নফল যাহা নবী (দঃ) বসিয়া পড়িয়াছেন;

মোসলেম শরীফের হাদীছে উহার উল্লেখ আছে—বেতের নামাযের পর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া সেই দুই রাকাত পড়ায়ও দোষ নাই; ঐ রাকাতদ্বয় বেতের নামাযের আনুষঙ্গিকরূপেই গণ্য।

যানবাহনের উপর থাকিয়া বেতের নামায পড়া

ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারী পশুর পিঠের উপর বসিয়া থাকিয়া রুকু-সেজদার সুযোগ অভাবে শুধু মাথার ইশারায় রুকু-সেজদা করিয়া, এমনকি কেবলা দিক ছাড়া নিজের সুযোগের দিকেই মুখ করিয়া সুন্নত-নফল নামায পড়া যায়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও ছাহাবীগণ তাহাজ্জুদ নামায পড়া অতি দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়া থাকিতেন। আরব দেশ যে দেশে অধিক উত্তাপ ও গরমের কারণে শুধু রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করা হয় সেই ভ্রমণ অবস্থায়ও তাহাজ্জুদ নামায ছাড়িতেন না; সব ক্ষেত্রে ভ্রমণ স্থগিত করাও কঠিন হইত—এমতাবস্থায় তাহাজ্জুদ নামায পশুর পিঠে বসিয়া উহার গতিমুখী মাথার ইশারায় আদায় করিতেন; তবুও তাহাজ্জুদ নামায নাগা করিতেন না। সব সুন্নত নফল নামাযের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা জায়েয রহিয়াছে। মোটর বাস, রেল, প্লেন, লঞ্চ জাহাজ ইত্যাদিতেও সুযোগের অভাব ক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থায় সুন্নত-নফল নামায পড়া যায়। যাঁহারা তাহাজ্জুদ, চাশ্‌ত, এশরাক, আওয়াবীন নামাযের অভ্যস্ত স্বীয় আমল ভঙ্গ না করিয়া উক্ত সুযোগ ব্যবহার করিতে পারেন।

বেতের নামায সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দৃষ্টে বলিয়াছেন, প্রাথমিক যুগে উহা সুন্নত ছিল, পরে নবী (দঃ) কর্তৃক উহা ওয়াজেব ঘোষিত হইয়াছে। উহা আর রুকু-সেজদা ও কেবলামুখী ছাড়া আদায় হইবে না। সেই প্রয়োজনে উহা আদায়ের জন্য যানবাহন হইতে অবতরণ করিতে হইবে, যেরূপ ফরজ নামায আদায়ের জন্য করিতে হয়। বেতের নামায ওয়াজেব হওয়ার পুর্বে উহাও অন্যান্য সুন্নত নফলের ন্যায় পশুর পিঠের উপর আদায় করা হইত। অবশ্য অন্যান্য ইমাম এবং অনেক ছাহাবীগণ বেতের নামাযকে সুন্নতই সাব্যস্ত রাখিয়াছেন।

৫৪৪। **হাদীছ ঃ**—সায়ীদ ইবনে ইয়াছার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত মক্কার পথে ভ্রমণে ছিলেন। প্রভাত নিকটবর্তী হইলে আমি যানবাহন হইতে অবতরণ করতঃ বেতের নামায পুর্ণভাবে আদায় করিয়া দ্রুত তাঁহার সহিত শামিল হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, প্রভাত নিকটবর্তী; তাই অবতরণ করিয়া বেতের নামায পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ যথেষ্ট মনে কর না? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই। তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) উটের উপর বেতের নামায পড়িয়াছেন।

৫৪৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারীর উপরে যেদিকে উহার গতি হইত সেই দিকেই মাথার

ইশারায় তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন, কিন্তু ফরজ নামায ঐরূপে পড়িতেন না বেতের নামায সোয়ারীর উপর পড়িতেন।

দোয়া-কুনুৎ পড়ার স্থান

৫৪৬। **হাদীছ ঃ**—আ'ছেম (রঃ) বলেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে দোয়া-কুনুতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, দোয়া-কুনুৎ পড়া পূর্বকাল হইতেই প্রচলিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রুকুর পূর্বে কি পরে? তিনি বলিলেন, রুকুর পূর্বে। আমি বলিলাম, অমুক ব্যক্তি বলিয়া থাকে, রুকুর পরে। তিনি বলিলেন, সে ভুল বলিয়া থাকে; অবশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ) এক মাসকাল রুকুর পরে দোয়া-কুনুৎ পড়িয়াছিলেন, (কিন্তু উহা বেতের নামাযের কুনুৎ ছিল না বরং অন্য বিষয়ের কুনুৎ ছিল, যাহা কারণ বিশেষে পড়া হইয়াছিল—) রসুলুল্লাহ (দঃ) সত্তরজন কোরআনের সুদক্ষ ছাহাবীকে কোন এক এলাকায় শিক্ষাদান কার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। 'রেয়েল' ও 'জাকওয়ান' গোত্রদ্বয়ের একদল কাফের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই বিশ্বাসঘাতকদের কার্য্যে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যধিক দুঃখিত হইয়া তাহাদের প্রতি বদদোয়া (ও অভিশাপ) করতঃ এক মাসকাল মগরেব ও ফজরের নামাযে ঐ কুনুৎ পড়িয়াছিলেন। (ইহাকে "কুনুতে-নাযেলাহ্" বলা হয়।)

মছআলাহ ঃ—কাফেরদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সংগ্রাম অবস্থায় বা কাফেরদের আক্রমণ আশঙ্কায় কিম্বা কাফের দল কর্তৃক মোসলমানদের প্রতি অত্যাচার বা ক্ষয়ক্ষতি সাধনের ঘটনা উপলক্ষে মোসলমানদের ঈমান, সংহতি অটুট থাকার এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও বিজয় লাভ ইত্যাদির দোয়া করা, আর কাফেরদের প্রতি বিচ্ছিন্নতা, পদস্খলন, ধ্বংস আল্লাহ তায়ালার আজাব ও পাকড়াও ইত্যাদির বদদোয়া করা—এই দোয়া ও বদদোয়াকে কুনুতে নাযেলাহ্ বলা হয়। "নাযেলাহ্" অর্থ বিপদ; মোসলমানদের বিপদে ইহা পড়া হয়; কাহারও মতে মগরেব ও এশায়ও পড়া যাইবে। এই কুনুৎ শেষ রাকাতে রুকুর পরে পড়া হয়। পক্ষান্তরে বেতের নামাযের কুনুৎ সর্বাবস্থায় এবং রুকুর পূর্বে পড়া হইবে।

৫৪৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন কোন দিন (ফজর বা এশার নামাযের) শেষ রাকাতের রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া—ছামিআল্লাহু-লেমান হামিদাহু, আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ বলার পর মক্কায় আবদ্ধ ও অত্যাচারিত দুর্বল মোসলমানদের জন্য বিশেষভাবে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিয়া দোয়া করিতেন এবং অত্যাচারী কাফেরদের প্রতি বদদোয়া করিতেন। সেই দোয়া বদদোয়ার অনুবাদ এই—

"হে আল্লাহ! (কাফেরদের কবল হইতে) আইয়্যাশ ইবনে আবু রবিয়াকে পরিত্রাণ দাও, সালামাহ ইবনে হেশামকে পরিত্রাণ দাও, ওলীদ ইবনুল ওলীদকে পরিত্রাণ দাও